উপন্যাস

বাঁধনহারা

কাজী নজরুল ইসলাম

সূচিপত্র

উৎসর্গ

সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
করকমলেষু
বন্ধু আমার! পরমাত্মীয়! দুঃখ-সুখের সাথি!
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাতি।
চাওয়ার অধিক পেয়েছি – বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন,
বন্ধু পেয়েছি – পাইনি মানুষ, পাইনি দরাজ মন।
চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,
হারায়েছি পথ – আঁধারে আসিয়া ধরিয়াছ তুমি পাণি।
চোখের জলের হয়েছ দোসর, নিয়েছ হাসির ভাগ,
আমার ধরায় রচেছে স্বর্গ তব রাঙা অনুরাগ।
হাসির গঙ্গা বয়েছে তোমার অশ্রু-তুষার গলি,
ফুলে ও ফসলে শ্যামল করেছে ব্যথার পাহাড়তলি!
আপনারে ছাড়া হাসায়েছ সবে হে কবি, হে সুন্দর;
হাসির ফেনায় শুনিয়াছি তব অশ্রুর মরমর!
তোমার হাসির কাশ-কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা,
অশ্রুর অঞ্জলি দিনু, লহো এ ‘বাঁধন-হারা’ ।
নজরুল
কলিকাতা
২৪ শ্রাবণ ১৩৩৪।

ক

করাচি সেনানিবাস,
২০এ জানুয়ারি (সন্ধ্যা)
ভাই রবু!

আমি নাকি মনের কথা খুলে বলিনে বলে তুমি খুব অভিমান করেছ? আর তাই এতদিন চিঠি-পত্তর লেখনি? মনে থাকে যেন, আমি এই সুদূর সিন্ধুদেশে আরব-সিন্ধুর তীরে পড়ে থাকলেও আমার কোনো কথা জানতে বাকি থাকে না! সমঝে চোলো, তারহীন বার্তাবহ আমার হাতে!

আমি মনে করেছিলাম, - সংসারী লোক, কাজের ঠেলায় বেচারির চিঠি-পত্তর দেবার অবসর জোটেনি এবং কাজেই আর উচ্চ-বাচ্য করবার আবশ্যক মনে করিনি ; কিন্তু এর মধ্যে তলে-তলে যে এই কাণ্ড বেধে বসে আছে, তা এ বান্দার ফেরেশ্‌তাকেও খবর ছিল না! - শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে জানলে আমি যে উঠোন পর্যন্ত নিকিয়ে রাখতাম!

আমি পল্টনের 'গোঁয়ার গোবিন্দ' লোক কিনা, তাই অত-শত আর বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন দেখছি তুমিও ডুবে ডুবে জল খেতে আরম্ভ করেছ! আমার আজ কেবলই গাইতে ইচ্ছে করছে সেই গানটা, যেটা তুমি কেবলই ভাবি-সাহেবাকে (ওরফে ভবদীয় অর্ধাঙ্গিনীকে) শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে -

মান করে থাকা আজ কি সাজে?
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে।

হাঁ, - ভাবিসাহেবাও আমায় আজ এই পনেরো দিন ধরে একেবারেই চিঠি দেননি। স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী কিনা!

তোমার একখানা ছোট্ট চিঠি সেই এক মাস পূর্বে - হাঁ, তা প্রায় একমাস হবে বই কি! - পেয়ে তার পরের দিনই 'প্যারেডে' যাওয়ার আগে এলোমেলো ভাবের কী কতকগুলো ছাই-ভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার এখন মনে নেই। সেদিন

মেজাজটা বড়ো খাট্টা ছিল, কারণ সবেমাত্র 'ডিউটি' হতে 'রিলিভ' হয়ে মুক্তি পেয়ে এসেছিলাম কিনা! তারপরেই আবার কয়েকজন পলাতক সৈনিককে ধরে আনতে 'ডেরাগাজি খাঁ' বলে একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল। এসব হ-য-ব-র-ল-র মাঝে কি আর চিঠি লেখা হয় ভাই? তুমিও বা আর কীসে কম? এই একটা ছোট্ট ছুতো ধরে মৌনব্রত অবলম্বন করলে! এ মন্দ নয় দেখছি।

তুমি যে মনুকে লিখে জানিয়েছ যে, আমি 'মিলিটারি লাইনে' এসে গোরাদেরই মতো কাঠখোট্টা হয়ে গেছি তাও আজ আমার জানতে বাকি নেই। আগেই বলেছি, তারহীন বার্তাবহ হে, ওসব তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ!

যখন আমায় কাঠখোট্টা বলেই সাব্যস্ত করেছ, তখন আমার হৃদয় যে নিতান্তই সজনে কাঠের ঠ্যাঙার মতো শক্ত বা ভাঙা বাঁশের চোঙার মতো খনখনে নয়, তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে। বিলক্ষণ দূর না হলে আমি অবিশ্যি এতক্ষণ 'যুদ্ধং দেহি' বলে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াতাম; কিন্তু এত দূর থেকে তোমায় পাকড়াও করে একটা 'ধোবি আছাড়' দিবার যখন কোনোই সম্ভাবনা নেই, তখন মসিযুদ্ধই সমীচীন। অতএব আমি দশ হাত বুক ফুলিয়ে অসিমুক্ত মসিলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি – 'যুদ্ধং দেহি!'

তোমার কথামতো আমি কাঠখোট্টা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এটা তো জান ভায়া যে, খোট্টাকাঠের উপরও চোট পড়লে সেটা এমন আর্তনাদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে, যেন ঠিক বুকের শুকনো হাড়ে কেউ একটা হাতুড়ির ঘা কশিয়ে দিলে আর কী। তোমার মতো 'নবনীতকোমল মাংসপিণ্ডসমষ্টি'র পক্ষে সেটার অনুভব একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা অসম্ভব বই কি!

তা ছাড়া যেটা জানবার জন্যে তোমার এত জেদ, এত অভিমান, তার তো অনেক কথাই জান। তার উপরেও আমার অন্তরের গভীরতর প্রদেশের অন্তরতম কথাটি জানতে চাও, পাকে-প্রকারে সেইটেই তুমি কেবলই জানাচ্ছ। – আচ্ছা ভাই রবু, আমি এখানে একটা কথা বলি, রেগো না যেন!

তোমার অভিমানের খাতির বেশি, না, আমার বুকের পাঁজর দিয়ে-ঘেরা হৃদয়ের গভীরতম তলে নিহিত এক পবিত্র স্মৃতিকণার বাহিরে প্রকাশ করে ফেলার অবমাননার ভয় বেশি, তা আমি এখনও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারিনি। তুমিই আমায় জানিয়ে দাও ভাই, কী করা উচিত!

আচ্ছা ভাই, যে শুক্তি আর কিচ্ছু চায় না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্তা হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে থুয়ে অতল সমুদ্রের তলে নিজকে তলিয়ে দিতে চায়, তাকে তুলে এনে তার বক্ষ চিরে সেই গোপন মুক্তাটা দেখবার এ কী মূঢ় অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের! এ কী নির্দয় কৌতূহল তোমাদের!

যাক, শিগ্‌গির উত্তর দিয়ো। ভাবিসাহেবাকে চিঠি দিতে হুকুম কোরো, নতুবা ভাবিসাহেবাকে লিখব তোমায় চিঠি দিতে হুকুম করবার জন্যে।

খুকির কথা ফুটেছে কি? তাকে দেখবার বড়ো সাধ হয়। … সোফিয়ার বিয়ে সম্বন্ধে এখনও এমন উদাসীন থাকা কি উচিত? তুমি যেমন ভোলানাথ, মা-ও তথৈবচ! আমার এমন রাগ হয়!

আমার জন্যে চিন্তা কোরো নো। আমি দিব্যি কিষ্কিন্ধ্যার লবাবের মতো আরামে আছি। আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে। দু-দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা! আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংসপেশীগুলো দেখাতে পারতাম!

দেখেছ, সামরিক বিভাগের কী সুন্দর চটক কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজিরা হাঁক পাড়ছেন, ‘বিজলি কা মাফিক চটক হও। – শাবাশ জোয়ান!’

এখন আসি। ‘রোল-কলের’ অর্থাৎ কিনা হাজিরা দেবার সময় হল। হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়র, বুট, পট্টি (এসব হচ্চে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুরমতো সাফ-সুতরো করে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল ‘রুট মার্চ’ বা পায়ে হণ্টন।

– ইতি

তোমার ‘কাটখোট্টা লড়ুয়ে’ দোস্ত

নূরুল হুদা

করাচি সেনানিবাস

২১এ জানুয়ারি (প্রভাত)

মনু!

আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে সে আর কী বলব! কী হয়েছে জানিস? কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে – যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার জোগাড় করেছিল, তা তার এখনকার এ-সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আশমানি রং-এর ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবি-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনিতে চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজু চুলগুলি বেয়ে এখনও দু-এক ফোঁটা করে জল পড়ছে, আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁওয়ায় সেগুলি সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মতো ঝিলমিল করে উঠছে! কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, তার এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারচি নে। বুঝতেই পারচ ব্যাপারটা ; – মেঘে মেঘে জটলা, তার ওপর হাড়-ফাটানো কনকনে বাতাস ; করাচি-বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালাশূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু করে কেঁপেছে, আর এখনকার এই শান্ত-শিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুংকার তুলে বেচারিকে আরও শঙ্কিত করে তুলেছে; বিজুরির তড়িদালোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো-হো করে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত-শিষ্ট মূর্তি, যেন কিচ্ছু জানেন না আর কী! বল তো ভাই, এতে কার না হাসি পায়? আর এ একটা বেজায় বেখাপ্পা রকমের অসামঞ্জস্য কিনা? আমার ঠিক এই প্রকৃতির দু-একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে। খুব একটা 'জাঁদরেলি' গোছের দাপাদাপি দৌরাত্মির চোটে পাড়া মাথায় করে তুলেছেন, হঠাৎ তাঁর মনে 'দার্শনিকের অন্যমনস্কতা' চলে এল আর অমনি এক লাফে তিনি তাঁর বয়সের আরও বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একজন প্রকাণ্ড প্রৌঢ়া গৃহিণীর মতো জলদগম্ভীর হয়ে বসলেন এবং কাজেই আমার মতো 'ঠোঁটকাটা ছ্যাবলা'র পক্ষে তা নিতান্তই সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সেরকম

ধিঙ্গি মেয়েদের বিপক্ষে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করতে সাহস করি নে; কারণ – এই বুঝলে কিনা – এখনও আমার 'শুভদৃষ্টি' হয়নি। ভবিতব্য বলা যায় না ভাই! কবি গেয়েছেন, – (মৎকর্তৃক সংস্কৃত) –

প্রেমের পিঠ পাতা ভুবনে,
কখন কে চড়ে বসে কে জানে!

অতএব এই স্থানেই আমার সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে 'ফুলস্টপ্', – পূর্ণচ্ছেদ!
আমার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন গো-মুখ্যুর মতো যা-তা প্রলাপ শুনে তোর চক্ষু হয়তো এতক্ষণ চড়ক গাছ হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হচ্ছিস দস্তুরমতো! নয়? – হবারই কথা! আমার স্বভাবই এই। আমি এত বেশি আবোল-তাবোল বকি যে, লোকের তাতে শুধু বিরক্ত হওয়া কেন, কথঞ্চিৎ শিষ্ট প্রয়োগেরই কথা!
যাক এখন ও-সব বাজে কথা। কী বলছিলাম? আজ প্রাতের আকাশটার শান্ত সজল চাউনি আমায় বড্ডো ব্যাকুল করে তুলেছে। তার উপর আমাদের দয়ালু নকিব (বিউগ্‌লার) শ্রীমান গুপিচন্দর এইমাত্র 'নো প্যারেড' (আজ আর প্যারেড নেই) বাজিয়ে গেল। সুতরাং হঠাৎ-পাওয়া একটা আনন্দের আতিশয্যে সব ব্যাকুলতা ছাপিয়ে প্রাণটা আজকার আকাশেরই মতো উদার হয়ে যাবার কথা! তাই গুপিকে আমরা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিলাম সব, একেবারে চার হাত-পা তুলে। সে আশীর্বাদটা শুনবি? 'আশীর্বাদং শিরচ্ছেদং বংশনাশং অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্ঠং পুড়ে মরং।' এ উৎকট আশীর্বাদের জুলুমে বেচারা গুপি তার 'শিঙে' (বিউগ্‌ল) ফেলে ভোঁ দৌড় দিয়েছে। বেড়ে আমোদে থাকা গেছে কিন্তু ভাই।
এমনই একটা আনন্দ পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যেত, যখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য হঠাৎ আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। স্কুল-প্রাঙ্গণে ছেলেদের উচ্চ হো-হো রোল, রাস্তায় জলের সঙ্গে মাতামাতি করতে করতে বোর্ডিং-এর দিকে সাংঘাতিক রকমের দৌড়, সেখানে গিয়ে বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখের ওপর এমন 'বাদল দিনে' ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কোমর বেঁধে অকাট্য যুক্তিতর্ক প্রদর্শন, অনর্থক অনাবিল অট্টহাসি, – আহা, সে কী আনন্দের দিনই না চলে গেছে! জগতের কোনো কিছুরই বিনিময়ে আমাদের সে মধুর হারানো

দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। ছাত্র-জীবনের মতো মধুর জীবন আর নেই এ কথাটা বিশেষ করে বোঝা যায় তখন, যখন ছাত্র-জীবন অতীত হয়ে যায়, আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে জগ-জগ (য) করে ওঠে।

আজ ভোর হতেই আমার পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যার যত গান জমা আছে স্টকে, কেউ আজ গাইতে কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদি কায়দায় ধরছেন, – 'আজ বাদরি বরিখেরে ঝমঝম!' কেউ কালোয়াতি চালে গাচ্চেন, – 'বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা!' – এ উলটো দেশে মাঘ মাসে বর্ষা, আর এটা যে নিশ্চয়ই মাঘ মাস, ভরা ভাদর নয়, – তা জেনেও একজন আবার কবাটি খেলার 'চুঁ' ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন, – 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' সকলের শেষে গম্ভীর মধুরকণ্ঠ হাবিলদার পাণ্ডেমশাই গান ধরলেন, – 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' গানটা সহসা আমার কোন্ সুপ্ত ঘায়ে যেন বেদনার মতো গিয়ে বাজল! হাবিলদার সাহেবের কোনো সজল-কাজল-আঁখি প্রেয়সী আছে কিনা, এবং আজকার এই 'শ্যামল ঘন নীল গগন' দেখেই তাঁর সেইরূপ এক জোড়া আঁখি মনে পড়ে গেছে কিনা, তা আমি ঠিক বলতে পারি নে, তবে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমারই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলি ওই গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিণীর সুরের বেদনায় গলে পড়ছিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম,

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে॥
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় ক্ষণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোনখানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

গান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন সমঝদার টেবিল, বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছেন সামনে, তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছেন। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি!' আবার দু-একজন বেশি রকমের রসজ্ঞ ভাবে বিভোর হয়ে গোপাল রায়ের অনুকরণে – 'দাদা গাই দেখ্‌সে, গোরু তার কী দেখব; দ্যাখ ঠাকুদ্দার বিয়ে, ধুচনি মাথবায় দিয়ে; – বাবারে, প্যাট গ্যালরে, শা … তোর কী হল রে' ইত্যাদি সুমধুর বুলি অবিরাম আওড়িয়ে চলেছেন। যত না বুলি চলছে, মাথা-হাত-পা-মুখ নড়ছে তার চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বেশি! গানটা ক্রমে 'আঙ্কোর প্লিজ' – 'ফিন জুড়ো' প্রভৃতির খাতিরে দু-তিনবার গীত হল। তারপর যেই এসে সমের মাথায় ঘা পড়েছে, অমনি চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে একটা বিকট ধ্বনি উঠল, 'দাও গোরুর গা ধুইয়ে! – তোমার ছেলের বাপ মরে যাক ভাই! তুই মরলে আর বাঁচবি নে বাবা!' সঙ্গে সঙ্গে বুটপট্টি-পরা পায়ে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য! – এদের এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে এও যেন আমাদের আর একটা ছাত্রজীবন। একটা অখন্ড বিরাট আমোদ এখানে সর্বদাই নেচে বেড়াচ্ছে। যারা কাল মরবে তাদের মুখে এত প্রাণ-ভরা হাসি বড্ড অকরুণ!
আমার কানে এখনও বাজছে –

– পড়িল মনে
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা,

সূচিপত্র

নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় ক্ষণে।

আর তাই আমার এ পরানপুটে কোন্‌খানে ব্যথা ফুটচে, আর হৃদয়কোণে কার কথা বেজে বেজে উঠচে।

আমি আমার নির্জন কক্ষটিতে বসে কেবলই ভাবচি যে, কার এ 'বিপুল বাণী এমন ব্যাকুল সুরে' বাজচে, যাতে আমার মতো শত শত হতভাগার প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা এমন মর্মন্তুদ হয়ে চোখের সামনে মূর্তি ধরে ভেসে ওঠে? ওগো, কে সে কবিশ্রেষ্ঠ, যাঁর দুটি কালির আঁচড়ে এমন করে বিশ্বের বুকের সুষুপ্ত ব্যথা চেতনা পেয়ে ওঠে? বিস্মৃতির অন্ধকার হতে টেনে এনে প্রাণ-প্রিয়তমের নিদারুণ করুণ স্মৃতিটি হৃদয়ের পরতে-পরতে আগুনের আখরে লিখে থুয়ে যায়? আধ-ভোলা আধ-মনে-রাখা সেই পুরানো অনুরাগের শরমজড়িত রক্তরাগটুকু চির-নবীন করে দিয়ে যায়। কে গো সে কে? – তার এ বিপুল বাণী বিশ্ব ছাপিয়ে যাক, সুরের সুরধুনী তাঁর জগতময় বয়ে যাক! তাঁর চরণারবিন্দে, কোটি কোটি নমস্কার!

'বিদায় ক্ষণের' নীরবে চেয়ে থাকার স্মৃতিটা আমার সারা হৃৎপিণ্ডটায় এমন একটা নাড়া দিলে যে, বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে আমারও আঁখি সজল হয়ে উঠেচে। ভাই মনু, আমায় আজ পুরানো দিনের সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি বড্ড ব্যথিয়ে তুলেছে! বোধ হয় আবার ঝর ঝর করেই জল ঝরবে। এ আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা ধরবার কোথাও ঠাঁই নেই।

খুব ঘোর করে পাহাড়ের আড়াল থেকে এক দল কালো মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেললে! আর কাগজটা দেখতে পাচ্ছি নে, সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

(বিকেলবেলা)

হাঁ, এইবার চিঠিটা শেষ করে ফেলি। সকালে খানিকক্ষণ গান করে বিকেলবেলা এখন মনটা বেশ হালকা মতো লাগচে।

চিঠিটা একটু লম্বা চওড়া হয়ে গেল। কী করি, আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে, হৃদয়ের সমস্ত কথা, যা হয়তো বলতে সংকোচ আসবে, অকপটে লিখে

যাই। কিন্তু সবটা পারি কই? আমার সবই আবছায়ার মতো। জীবনটাই আমার অস্পষ্টতায় ঘেরা।

রবিয়লকে চিঠি লিখেছি কাল সন্ধ্যায়। বেশ দু-একটা খোঁচা দিয়েছি! রবিয়ল অসংকোচে আমার উপর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের যেরকম দাবি করে, আমি কিছুতেই তেমনটি পারি না। কী জানি কেন, তার ওপর স্বতই আমার ভক্তিমিশ্রিত কেমন একটা সংকোচের ভাব আসে। তবুও সে ব্যথা পাবে বলে আমি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই তার সঙ্গে চিঠি-পত্তর ব্যবহার করি। কথাটা কী জান? সে একটু যেন মুরব্বি ধরনের, কেমন রাশভারি লোক, তাতে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছে। এরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের মতো ছাল-পাতলা লোকের মোটেই মিশ খায় না। কিন্তু ও আর আমি যখন বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম, তখন তো এমন ছিল না!

লোকটার কিন্তু একটা গুণ, লোকটা বেজায় সোজা! এই রবিয়ল না থাকলে বোধ হয় আমার জীবন-স্রোত কোনো অচেনা অন্য দিকে প্রবাহিত হত। রবু আমায় একাধারে প্রাণপ্রিয়তম বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ভ্রাতার মতোই দেখে। রবিয়লের – রবিয়লের-চেয়েও সুন্দর স্নেহ আমি কখনও ভুলব না।

সংসারে আমার কেউ না থাকলেও রবিয়লদের বাড়ির কথা মনে হলে মনে হয় যেন আমার ভাই-বোন-মা সব আছে!

রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোর্তিময়ী জননীর কথা মনে হলে আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে। – আমি কিন্তু বড্ড অকৃতজ্ঞ! না? বড্ড অকৃতজ্ঞ! না? এখন আসি ভাই, – বড্ড মন খারাপ কচ্চে। ইতি –

হতভাগা

নূরুল হুদা

খ

সালার
২৯শে জানুয়ারি
(প্রভাত,- চায়ের টেবিল সম্মুখে)
নূরু!

তোর চিঠিটা আমার ভোজপুরি দারোয়ান মশায়ের 'থ্রু' দিয়ে কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ বেশে এসে হাজির। দেখি, রিডাইরেকটের ধস্তাধস্তিতে বেচারার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত লিপিবরের বক্ষ চিরে তার লিপিলীলার অবসান করে দিলাম। - বেজায় উষ্ণমস্তিষ্ক চায়ের কাপ তখন আমার পানে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল। খুব ধৈর্যের সঙ্গে তোর লিপিচাতুর্য - যাকে আমরা মোটা কথায় বাগাড়ম্বর বলি দেখে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ ঢেলে আগে চায়ের ক্রোধ নিবারণ করলাম। তারপর দু-চামচ চিনির আমেজ দিতেই এমন বদরাগী চায়ের কাপটি দিব্যি দুধে-আলতায় রঙিন হয়ে শ্রান্ত-মধুর-রূপে আমার চুম্বনপ্রয়াসী হয়ে উঠল। তুই শুনে ভয়ানক আশ্চর্য হবি যে, তোর 'কোঁদলে' 'চামুণ্ডা' 'রণরঙ্গিণী' ভাবিসাহেবা 'তত্রস্থানে' সশরীরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও (অবিশ্যি, তখন গুম্ফশ্মশ্রুবহুল বিশাল লাঠিস্কন্ধে ভোজপুরি মশাই ছিলেন না সেখানে) এবং তাঁর মৌরসিস্বত্ব বেমালুম বেদখল হচ্ছে দেখেও তিনি কোনো আপিল পেশ করেননি। আহা হা! তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী, 'উদ্ভট ত্যাগিনী' এ ঘোর কলিকালে মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে, নিতান্তই দুর্লভ। আশা করি মৎকর্তৃক তোর শ্রদ্ধেয়া ভাবিসাহেবার এই গুণকীর্তন (কোঁদলে রণরঙ্গিণী আর চামুণ্ডা এই কথা কটি বাদ দিয়ে কিন্তু!) তোর পত্র মারফতে তাঁর গোচরীভূত হতে বাকি থাকবে না।

আমাদের খুকির বেশ দু-একটি করে কথা ফুটছে। - এই দ্যাখ, সে এসে তোর চিঠিটার হাঁ-করে থাকা ক্লান্ত খামের মুখে চামচা চামচা চা ঢেলে তার তৃষ্ণা নিবারণ করচে, আর বলচে 'চা - পিয়াচ!' - সে তোর ওই রণসাজ-পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা দেখে চা-চা করে ছুটে যায়, আবার দু-এক সময় ভয়ে পিছিয়ে

আসে। এই খুদে মেয়েটা সংসারের সঙ্গে আমায় পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? এ ‘আফলাতুন’ মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থ-চিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে। আর সোফিয়ার তো সে জান্! মাকে সেদিন এই নিয়ে ঠাট্টা করাতে, মা বললেন, ‘বাবা, মূলের চেয়ে সুদ পিয়ারা! এখন ঠাট্টা করছিস, পরে বুঝবি যখন তোর নাতি-পুতি হবে।’ – মা-র নমাজ পড়ার তো সে ঘোর বিরোধী। মা যখন নমাজ পড়বার সময় ‘সেজদা’ যান, সে তখন হয় মায়ের ঘাড়ে চড়ে বসে থাকে, নতুবা তাঁর ‘সেজদা’র জায়গায় বসে ‘দা-দা’ করে এমন করুণভাবে কাঁদতে থাকে যে, মায়ের আর তখনকার মতো নমাজই হয় না! আবার মায়ের দেখাদেখি সেও খুব গম্ভীরভাবে নমাজ পড়ার মতো মায়ের সঙ্গে ওঠে আর বসে! তা দেখে আমার তো আর হাসি থামে না! এই এক রত্তি মেয়েটা যেন একটা পাকা মুরুব্বি! ঝি-দের অনুকরণে সে আবার হাত-মুখ খিঁচিয়ে মায়ের সাথে ‘কেজিয়া’ করতে শিখেছে। দুষ্টু ঝিগুলোই বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছে, – খুকি কেজিয়ার সময় মাকে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, ‘দুঃ! ছতিন! – ছালা – ছতিন!’

তোকে অনেক কথাই জানাতে হবে। কাজেই চিঠিটা হয় তোরই মতো ‘বক্তিমে’য় ভরা বলে বোধ হবে। অতএব একটু মাথা ঠান্ডা করে পড়িস। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, সবসময় সময় পাই না। আবার সময় পেলেও চিঠি লেখার মতো একটা শক্ত কাজে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। তাতে আমার ধাত তো তোর জানা আছে, – যখন লিখি তখন খুবই লিখি, আবার যখন লিখি নে তখন একেবারে গুম। তুই আমার অভিমানের কথা লিখেছিস, কিন্তু ওই মেয়েলি জিনিসটার সঙ্গে আমার বিলকুল পরিচয় নেই। আর তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ বলে বেশি লাফালাফি করতে হবে না তোকে, ও সন্দেশওয়ালার নাম আমি চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন, আমার সহধর্মিণী-সহোদর শ্রীমান মনুয়র! দেখেছিস আমার দরবেশি কেরামতি! তুই হচ্ছিস একটি নিরেট আহাম্মক, তা না হলে ওর কথায় বিশ্বাস করিস? হাঁ, তবে একদিন কথায় কথায় তোকে কাঠখোট্টা বলে ফেলেছিলাম বটে! কিন্তু তোর এখনকার লেখার তোড় দেখে আমার বাস্তবিকই অনুশোচনা হচ্চে যে, তোকে ওরকম বলা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। এখন আমার ইচ্ছে হচ্চে, তোর ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দি, কিন্তু নানান ঝঞ্ঝাটে আমার

বুদ্ধিটা আজ মগজে এমন সাংঘাতিক রকমে দৌড়ে বেড়াচ্ছে যে, তার লাগামটি কষে ধরবারও জো-টি নেই!...

এই হয়েছে রে, – হ – য়ে – ছে! – ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মুড়ো ঝ্যাঁটাহস্তে দুটো ঝি-এর মধ্যে কোঁদল 'ফুল ফোর্সে' আরম্ভ হয়ে গেছে। – বুঝেছিস, এই মেয়েদের মতো খারাব জানোয়ার আর দুনিয়ায় নেই। এরা হচ্ছে পাতিহাঁসের জাত। যেখানেই দু-চারটে জুটবে, সেখানেই 'কচর কচর বকর বকর' লাগিয়ে দেবে। এদের জ্বালায় ভাবুকের ভাবুকতা, কবির কল্পনা এমন করুণভাবে কর্পূরের মতো উবে যায় যে, বেচারিকে বাধ্য হয়ে তখন শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই নিশ্চেষ্ট ভ্যাবাকান্ত হয়ে পড়তে হয়। গেরো –গেরো! দুত্তোর মেয়েমানুয়ের কপালে আগুন! এরা এ ঘর হতে আমায় উঠাবে তবে ছাড়বে দেখছি। অতএব আপাতত চিঠি লেখা মুলতবি রাখতে হল ভাই। আমার ইচ্ছে হয়, এই মেয়েগুলোকে গোরু-খেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই গিয়ে। ওঃ, সব গুলিয়ে দিলে আমার!

(দুপুরবেলা)

বাপ রে বার! বাঁচা গেছে! – ঝি দুটোর মুখে ফেনা উঠে এইমাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য মাত্র সে ঝগড়াটা ধামাচাপা আছে। এই অবসরে আমিও চিঠিটা শেষ করে ফেলি। নইলে, ফের জেগে উঠে ওরা যদি ধামাচাপা ঝগড়াটার জের চালায় তা হলেই গেছি আর কী!

অনেক সময় হয়তো আমার কাজে কথায় একটু মুরুব্বি ধরনের চাল অলক্ষিতেই এসে পড়ে। আর তোর মতো চিরশিশু মনের তাতেই ঠেকে হোঁচট খেয়ে ভ্যাবা-চ্যাকা লেগে যায়, নয়? কিন্তু আমার এদিন ছিল না, আমার মনে তোরই মতো একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল রে, সে আজ বাঁধা পড়ে তার সে সরল চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে। তাই বড়ো দুঃখে আমার সেই মনের বনের হরিণশিশু জলভরা চোখে আকাশের মুক্ত নীলিমায় চেয়ে দেখে, আর তার এই সোনার শিকলটায় করুণভাবে ঝংকার দেয়।... যাক ওসব কথা। তোকে একটা নীরস তত্ত্বকথা শুনাতে চাই এখানে, সেইটাই মন দিয়ে শোন। –

মানুষ যতদিন বিয়ে না করে, ততদিন তার থাকে দুটো পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোনো দ্বিপদ প্রাণীর মতো হেঁটে বেড়াতে পারে, মুক্ত আকাশের মুক্ত পাখির মতো স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে; – কিন্তু যেই সে বিয়ে করলে, অমনি হয়ে গেল তার দু-জোড়া বা এক গণ্ডা পা। কাজেই সে তখন হয়ে গেল একটি চতুষ্পদ জন্তু। বেচারার তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা তো গেলই (কারণ চার-চারটে পা নিয়ে তো কোনো জন্তুকে উড়তে দেখলাম না!) অধিকন্তু সে হয়ে পড়ল একটা স্থাবর জমি-জমারই মতো। একেবারে মাটির সঙ্গে ‘জয়েন’ ! তারপর দৈবক্রমে যদি একটি সন্তান এসে জুটল, তাহলে হল সে একটি ষটপদ মক্ষিকা – সর্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশবৃদ্ধি হইলেই – অষ্টপদ পিপীলিকা; দিন নেই, রাত নেই – ছোটো শুধু আহারের চেষ্টায়। তারপর, এই বংশবৃদ্ধি যখন বংশ-ঝাড়েরই মতো চরম উন্নতি লাভ করল, অর্থাৎ কিনা নিতান্ত অর্বাচীনের মতো গিন্নি যখন এক বস্তা সন্তান প্রসব করে ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হয়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো! বেশ একটা হতাশ – নির্বিকার ভাব! কোনো বস্তু নেই – ছুঁইলেই জড়সড়।

আমার এত দূর উন্নতি না হলেও যখন আল্লার নাম নিয়ে শুরু হয়েছে রে ভাই, তখন কি আর একে আগড় দিয়েও ঠেকানো যাবে! এ রকম অবস্থায় পড়লে সে সত্যি সত্যিই ‘সবারই মত বদলায়!’ ...

তারপর, ওরে ছ্যাঁচা ঝিনুক! তুই যে অত করে নিজকে লুকিয়ে রাখতে চাস সমুদ্দুর, না ডোবার ভিতরে, কিন্তু পারবি কি! আমি যে এঁটেল ‘লটে-ছ্যাঁচড়’ ডুবুরি! তুই পারস্যোপকূলের সমুদ্রের পাঁকে গিয়ে লুকোলেও এ ডুবুরির হাত এড়াতে পারিবি নে, জেনে রাখিস। মানিক কি কখনও লুকানো যায় রে আহাম্মক? খোশবুকে কি রুমাল চাপা রাখা যায়?... হায় কপাল, এই কুড়ি-একুশ বছর বয়সে তোর মতো উদাসীনরা আবার সংসারের কী বুঝবে? শুধু কবির কল্পনায় তোরা সংসারকে ভালোবাসিস, এখানের যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর কেবল তাই তোদের স্বচ্ছ প্রাণে প্রতিফলিত হয়, তাই তোদের সঙ্গে আমাদের দুনিয়াদার লোকের কিছুতেই পুরোমাত্রায় খাপ খায় না। এক জায়গাতে একটু ফাঁক থাকবেই থাকবে, তা আমরা যতই মিশ খাওয়াতে চেষ্টা করি না! কারণ, বড়ো কঠিনভাবে দুনিয়ার – বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর সত্যগুলো আমাদের হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হয়! তোরা

কল্পনারাজ্যের দেবশিশু, বনের চখা-হরিণ, আর আমরা, বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসে-গড়া মানব, খাঁচার পাখি! – এইখানেই যে ভাই মস্ত আর আদত বৈষম্য! কোনো ফরাসি লেখক বলেছেন যে, খোদা মানুষকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন শুধু মনকে গোপন করবার জন্যে। আর এ একেবারে নিরেট সত্য কথা। তাই আমার কেন মনে হচ্ছে যে, তুই বাইরে এত সরল, এত উদার, এমন শিশু হয়েও যেন কোন্ এক বিপুল ঝঞ্ঝা, কী একটা প্রগাঢ় বেদনার প্রচ্ছন্ন বেগ অন্তরে নিয়তই চেপে রাখছিস! – মানুষকে বোঝা যে বড্ড শক্ত ব্যাপার, তা জানি, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়াও নেহাত সহজ নয়। তোদের মতো লোককে চিনতে পারেন এক তিনিই, যিনি নিজের বুকে বেদনা পেয়েছেন; আর সেই বেদনা দিয়ে যদি তিনি তোর বেদনা বুঝতে পারেন তবেই, তা না হলে যতো বড়োই মনস্তত্ত্ববিদ হন, এরকম শক্ত জায়গায় তাঁরা ভয়ানকভাবে ঠকবেন! একটি প্রস্ফুটিত ফুলের হাসিতে যে কত কান্নাই লুকানো থাকে, তা কে বুঝবে? ফুলের ওই শুভ্র বুকে যে ব্যথার কীটে কত দাগ কেটেছে, কে তা জানতে চায়? – আমরা উপভোগ করতে চাই ফুলের ওই হাসিটি, ওই উপরের সুরভিটুকু!

সত্য বলতে গেলে, আমি যতই বড়াই করি ভাই, কিন্তু তোকে বুঝে উঠতে পারলাম না। যখনই মনে করেছি, এই তোর মনের নাগাল পেয়েছি, অমনি তোর গতি এমন উলটো দিকে ফিরে যায় যে, আমি নিজের বোকামিতে নিজেই না হেসে থাকতে পারিনে। এই তোর যুদ্ধে যাবার আগের ঘটনাটাই ভেবে দেখ না! – আমার যেন একদিন মনে হল যে, সোফিয়ার সই মাহ্‌বুবাকে দেখে তুই মুগ্ধ হয়েছিস। তাই বড়ো আনন্দে সেদিন গেয়েছিলাম, 'এবার সখী সোনার মৃগ দেয় বুঝি ধরা!' এবং আমার মোটা বুদ্ধিতে সব বুঝেছি মনে করে তার সঙ্গে তোর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করলাম, এমন সময় হঠাৎ একদিন তুই যুদ্ধে চলে গেলি। আমার ভুল ভাঙল, অনেকের বুক ভাঙল! সোনার শিকল দেখে পাখি মুগ্ধ হয়ে যেন কাছিয়ে এসেছিল, কিন্তু যেই জানলে ওতে বাঁধনের ভয় আছে, অমনি সে সীমাহীন আকাশে উড়ে গেল।

এইখানে আর একটা কথা বলি, কিন্তু তুই মনে করিস না যেন যে আমি নিজের সাফাই গাইছি। প্রথমে সত্য সত্যই তোর এ বিয়েতে আমার উৎসাহ ছিল না, যদিও কেউ ক্ষুণ্ন হবে বলে আমি এ কথাটা কাউকে তেমন জানাইনি। তার প্রধান কারণ,

তুই কোথাও কোনো ধরা-ছোঁওয়া দিসনি। আবার যেখানে ইচ্ছা করে ধরা দিতে গিয়েছিস, সেইখানেই কার নিষ্ঠুর হাত এসে তোকে আলাদা করে দিয়েছে, মুক্ত করে দিয়েছে! সে-কোন্ চপল যেন তোর খেলার সাথি! সে-কোন্ চঞ্চলের যেন তুই ছাড়া-হরিণ! তাই কোনো বাঁধন তোকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু এ সব জেনেও এমন কিছু ঘটল, যাতে আমারও মনটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল।...আমার মস্ত বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই মানুষের মন বুঝতে বেশি ওস্তাদ! কিন্তু এখন দেখছি, সব ভুয়ো। কারণ তোর মাননীয়া ভাবিসাহেবাই আমায় কান-ভাঙানি দিয়েছিলেন এবং সাফ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তুই নাকি মাহ্‌বুবাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলি, এমনকি তুই নাকি আর তোর মধ্যে ছিলি নে এবং মাহ্‌বুবাও নাকি তোর পায়ে একেবারে মনঃপ্রাণ 'ডারি' দিয়েছিল। এমন দু-তরফা ভালোবাসাকে মাঝ-মাঠে শুকোতে দেওয়া আমাদের মতো নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে একরকম পাপ কিনা, তাই বড়ো খুশি হয়েই তোদের এ বুকের ভালোবাসাকে সোনার সুতোয় গেঁথে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজের বেলায় হয়ে গেল যখন সব উলটো, তখন যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ঘাড়েই হুড়মুড় করে পড়ল! অবশ্য আমার একটু সব দিক ভেবে কাজ করা উচিত ছিল, কিন্তু যুবতিদের – আবার তিনি যদি ভার্যা হন, তবে তো কথাই নেই – এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে, যাহা মহা জাহাঁবাজ পুরুষেরও মন একেবারে গলে মোম হয়ে যায়! তখনকার মতো বেচারার আর আপত্তি করবার মতো কোনো শক্তিই থাকে না। সাধে কী আর জ্ঞানীরা বলেছেন যে, মেয়েরা আগুন, আর পুরুষ সব মোম, – কাছাকাছি হয়েছে কী গলেছে। আমি আমার ধৈর্যশীলতার জন্যে চির-প্রসিদ্ধ কি-না, তাই এখন যত মিথ্যা অপরাধের বোঝাগুলোও নির্বিকার চিত্তে বইতে হচ্ছে। এক কথায়, – ওই যে কী বলে, – আমি হচ্ছি 'সাহেবের দাগা পাঁঠা!'

তারপর, আমি এখন ভাবচি যে, যে-যুদ্ধের মানুষ কাটাকাটির বিরুদ্ধে'বক্তিমের' তোড়ে তুই সুরেনবাবুর রুটি মারবার জোগাড় করেছিলি, মাঝে আবার জীবহত্যা মহাপাপ বলে স্রেফ শাকান্নভোজী নিরামিষ-প্রাণী বা পরমহংস হয়ে পড়েছিলি, সেই তুই জানি নে কোন্ অনুপ্রেরণায় এই ভীম নরহত্যার যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লি! জানি নে, সে কোন্ বজ্রবাঁশি তোকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল, তোর এই বাঁধন হারা প্রাণটিকে জননী জন্মভূমির পায়ে ফুলের মতো উৎসর্গ করে দিতে! তবে কি এটা

তোর সেই বিপরীত স্বভাবটা, যেটা অন্যায়ের খোঁচা না খেলে জেগে উঠত না? অন্যায়কে রুখতে গিয়ে এক একদিন তুই যেরকম খুনোখুনি ব্যাপার বাধিয়ে তুলতিস, তা তো আর কারুর অবিদিত নেই! আমি এখনও ভাবি, সে সময় কীরকম প্রদীপ্ত হয়ে উঠত একটা অমানুষিক শক্তিতে তোর ওই অসুরের মতো শক্ত শরীরটা। আসানসোলে ম্যাচ খেলতে গিয়ে যেদিন একা এক প্রচণ্ড বংশদণ্ড দিয়ে প্রায় এক শত ইংরেজকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি, সেই দিন বুঝেছিলাম তোর ওই কোমল প্রাণের আড়ালে কত বড়ো একটা আগ্নেয় পর্বত লুকিয়ে আছে, যেটা নিতান্ত উত্তেজিত না হলে অগ্ন্যুদ্গিরণ করে না।

বড়ো কৌতূহল হয়, আর জানাও দরকার, তাই তোর সমস্ত কথা জানতে চেয়েছিলাম। তাতে যদি তোর কোনো পবিত্র স্মৃতির অবমাননা হয় মনে করিস, তবে আমি তা জানতে চাই নে। আমি সেরকম নরাধম নই। কিন্তু এ কোন্ ভাগ্যবতী রে যে তোর এমন হাওয়ার প্রাণেও রেখা কেটে দিয়েছে? সে কোন্ সুন্দরীর বীণের বেদন তোর মতো চপল হরিণকে মুগ্ধ করেছে? কেন তুই তবে এসব কথা কাউকে জানাসনি? তুই সত্য সত্যই একটা মস্ত প্রহেলিকা!

সোফিয়ার বিয়ে নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুই নিজের চরকায় তেল দে। তোর মতো বিবাহ-বিদ্বেষী লোকের আবার পরের বিয়ের এত ভাবনা কেন? আমরা মনে করেছি, আর তোর ভাবিরও নিতান্ত ইচ্ছা যে, মনুয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই। তোর কী মত? তবে আরও দু-চার মাস দেরি করতে হবে। কেননা মনুর বি. এ. পরীক্ষা দেবার সময় খুব নিকট। ওর পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেলেই শুভকার্যটা শেষ করে ফেলব মনে করচি। তুই সেই সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে পারবি নাকি? তুই না এলে যে ঘরের সবকিছু কাঁদবে!

তোর সামনে সোফিয়া তোর খুব বদনাম করত আর তোর সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত বটে, কিন্তু তুই যাবার পর হতেই তার মত আশ্চর্য রকমে বদলে গিয়েছে। সে এখন তোর এত বেশি প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছে যে, আমি হিংসে না করে থাকতে পারচি নে। তোর এই যুদ্ধে যাওয়াটাকে সে একটা মস্ত কাজের মতো কাজ বলে ডঙ্কা পিটুচ্চে। তুই চলে যাবার পর ওর যদি কান্না দেখতিস! সাত দিন সাত রাত না খেয়ে না দেয়ে সে শুধু কেঁদেছিল। এখনও তোর কথা উঠলেই তার চোক ছলছল করে ওঠে।... সে তার হাতের বোনা কয়েকটা 'কম্ফর্টার' আর

ফুল তোলা রুমাল পাঠিয়েছে তোকে, বোধ হয় পেয়েছিস। তোকে তোদের এই যুদ্ধের পোশাকে দেখবার জন্যে সে বড্ড সাধ করেছে। এখনকার ফটো থাকে তো পাঠাস। যখন যা টাকাকড়ির দরকার হবে জানাস। এখন আর কোনো কষ্ট হয় না তো? এখানে সব একরকম ভালো।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, তুই আমায় নবনীতকোমল মাংসপিণ্ড-সমষ্টি বলে ঠাট্টা করেছিস, কিন্তু এখন এলে দেখতে পাবি, এই দু-বছরেই সংসার আর বিবি-সাহেবার চাপে আমি সজনে কাঠের চেয়েও নীরস হয়ে পড়েছি । তোর উপরটা লোহার মতো শক্ত হলেও ভিতরটা ফুলের চেয়েই নরম! তুই বাস্তবিকও শুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভিতরে মানিক। আর আমি হচ্চি ওই – সজনে কাঠের শুকনো ঠ্যাঙা, – না উপরটা মোলায়েম, না ভিতরে আছে কিছু রস-কষ। একেবারে ভুয়ো – ভুয়ো! ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

হাড়গোড়-ভাঙা ‘ দ’

রবিয়ল

বাবা নূরু!

আমার স্নেহ-আশিস জানবে। মাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলে নিমকহারাম ছেলে? আমাকে ভুলেও একটা চিঠি দেওয়া হল না এতদিনের মধ্যে? আমি প্রথমে রেগে চিঠিই দিইনি। যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবি-দাওয়া কীসের? ওরে, তোরা কী করে মায়ের মন বুঝবি? তা যদি বুঝতিস তবে আর এমন করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করতিস নে আমায়। নাই বা হলাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি, তবু যে আমি কোনোদিন তোকে অন্যের বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! একটা কথা আছে, ‘পেটে ধরার চেয়ে চোখে-ধরা বেশি লাগে।’ তোরা একথা বুঝতে পারবিনে।

আমি চিঠি লিখতাম না বাবা, তবে রবু সেদিন হাসতে হাসতে বললে, ‘ মা-জান, তুমিই ভালো করে নূরুর কথাবার্তায়, গল্পে যোগ দিতে না বলে সে রেগে চলে গিয়েছে।’ দেখেছিস কথার ছিরি? ‘ছিঁচে পানি’ আর মিছে কথা মানুষের গায়ে বড়ো লাগে তাই কথাটা মিথ্যে হলেও আমার জানে এত লাগল – যেমন মায়ের দোষে

ছেলে চলে যাবার পর সেই ব্যথাটা মায়ের প্রাণে গিয়ে বাজে! জানি, তুই কক্ষণো সে রকম ভাবতে পারিসনে, তবু এইখানে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি বাপ, কেননা, ‘হায়াত-মওতে’র কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! আমার দিন তো এবার ঘনিয়েই আসচে। একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়ব যে, তোরা ঘরগুষ্টি মিলে কেঁদেও আর জাগাতে পারবি নে। আহা, খোদা তাই যেন করেন, তোদের কোনো অমঙ্গল যেন আমায় আর দেখে যেতে না হয়। শোকে-শোকে এ বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। তাই এখন খোদার কাছে চাইছি, যেন তোর হাতের মাটি পেয়ে মরতে পারি। আমার জান তোর ওখানেই পড়ে আছে, কখন ছেলের কী হয়!

দু-এক সময়ে তোর ছেলেমি আর খ্যাপামি দেখে খুবই বিরক্ত হতাম, কিন্তু ওই বিরক্তির মধ্যে যে কত স্নেহ-ভালোবাসা লুকানো থাকত, তোরা ছেলেমানুষ তা বুঝতে পারবিনে। কিন্তু এসব তুচ্ছ কথা কি এখনও তোর প্রাণে জাগে? মায়ে-ছেলেয় যে কত আদর-আবদার হয় বাপ!

অবিশ্যি আমার এও মনে পড়ে যে, তুই যখন অনবরত বকর-বকর করে আমাদের সংসারী লোকের পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক কথাগুলো বকে যেতিস আর নিজের ভাবে নিজেই মশগুল হয়ে পড়তিস, তখন আমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠে অন্য কাজে যেতাম, তোর কিন্তু কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে যেত। তোদের ছেলে-পিলের দলে কী আর আমাদের মতো সেকেলে মরুব্বিদের বসে থাকা মানায়? – রবু বলে কী, এই সবে তোর মনে বড্ড কষ্ট হত। সত্যি কি তাই? রবুর মতো বোকা ছেলে তো আর তুই নোস যে, এইসব মনে করে আমায় কষ্ট দিবি!

তোরা এইসব ছেলে-মেয়েগুলোই তো আমাদের দুশমন। মা-দের যে কত জ্বালায় জ্বলতে হয়, কী চিন্তাতেই যে দিন কাটাতে হয়, তা যদি ছেলেরা বুঝত তা হলে দুনিয়ার মা-রা ছেলেদের খামখেয়ালির জন্য এত কষ্ট পেত না! উঃ, হাড় কালি হয়ে গেল রে, হাড় কালি হয়ে গেল!

এখন দিনরাত খোদার কাছে মুনাজাত করছি, কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনেন। কী পাগলামিই না করলি, একবার ভেবে দেখ দেখি।

খুব ভালো করে থাকিস! খাবার-দাবার খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় সেখানে ? আমাদের পোড়া মুখে যে আহার রুচে না! খেতে গেলেই মনে হয়, – আহা, ছেলে আমার

কোন্ বিদেশে হয়তো না খেয়ে না দেয়ে পড়ে আছে, আর আমি হতভাগি মা হয়ে ঘরে বসে বসে রাজভোগ গিলছি। অমনি চোখের জলে হাতের ভাত ভেসে যায়! জলদি চিঠি দিস আর সেখানকার সব কথা জানাস।

বাকি সব রবুর চিঠিতে জানবি। আর লিখতে পারচিনে। তারা কেউ তোর চিঠি পড়ে আমায় শুনায় না। নিজে কী যে ছাই-পাঁশ লেখে দু-দিন ধরে, তাও জানায় না। আমার হাত কাঁপে, তবু নিজেই লিখলাম চিঠিটা। কী করি বাবা, মন যে বালাই, কিছুতেই মানে না। তাছাড়া আমিও মুরুক্ষুর মেয়ে নই! আমার বাপজি (আল্লাহ্ তাঁকে জিন্নত থেকে নসিব করুন) মৌলবি-মৌলানা লোক ছিলেন, তাঁর পায়ের এতটুকু ধুলো পেলে তোরা বত্তিয়ে যেতিস! ... ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

তোর মা

গ

বাঁকুড়া
২৬এ জানুয়ারি
(বিকেলবেলা)
অথ নরম গরম পত্রমিদম কার্যনঞ্চাগে বিশেষ! বাঙালি পলটনের তালপাতার সিপাই শ্রীল শ্রীযুক্ত নূরুল হুদা বরাবরেষু।...

বুঝলি নূরু! তোর চিঠি নিয়ে কিন্তু আমাদের বোর্ডিং-এর কাব্যিরোগাক্রান্ত যাবতীয় ছোকরাদের মধ্যে একটা বিভ্রাট রকমের আলোচনা চলেছে। এঁদের সবাই ঠাউরেছেন, তুই একটা প্রকাণ্ড ‘হবু-কবি’ বা কবি-কিশলয়! তোর যে ভবিষ্যৎ দস্তুরমতো ‘ফর্সা’ এবং ক্রমে তুই-ই যে রবিবাবুর ‘নোবেল প্রাইজ’ কেড়ে না নিস, অন্তত তাঁর নাম রাখতে পারবি, এ সিদ্ধান্তে সকলের একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন। তবে আমার ধারণা একটু বিভিন্ন রকমের। ভবিষ্যতে তুই কবিরূপে সাহিত্য-মাঠে গজিয়ে উঠবি কিনা, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই, – কিন্তু ‘কপি’ হয়েই আছিস। কেননা কবির চেয়ে কপির উপাদানই তোর মধ্যে বেশি! – আর, ছোকরাদের ওই হইচই-এর সম্বন্ধে আমার বিশেষ তেমন বক্তব্য নেই, তবে এইমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে, উপরে হইহই ব্যাপার! রইরই কাণ্ড!! জর্মানির পরাজয়!!! লেখা থাকলেও ভিতরে সেই – ফসিউল্লার গোলাব-নির্যাস, চারি আনা শিশি। নয়তো সিলেট চুন!

তাই বলে মনে করিসনে যেন যে, দেঁতো ‘ক্রিটিকের মতো ছোবলে’ তোকে আমি জখম করে দিচ্ছি। আমিও আবার হুজুগে-সমালোচকদের হল্লায় সায় দিয়ে বলছি, কপালের দোষে নিতান্তই যদি তুই সাহিত্য-রথী না হোস, তবে অন্তত সাহিত্য-কোচোয়ান বা গাড়োয়ান হবিই হবি। আর ওই আগেই বলেছি, কবিবর না হোস, কপিবর তো হবিই!

তুই কবি না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন জবরদস্ত কবি, তাতে সন্দেহ নাস্তি! প্রমাণস্বরূপ, – আমি হলে তোর ওই বর্ষাস্নাতা

সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা কীরকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় করতাম, অবধান কর (যদিও বর্ণনাটি ‘আন্দাজিক্যালি’ হবে।) :

ঝরা থেমেছে। উলঙ্গ প্রকৃতির স্থানে স্থানে এখনও জলের রাশ থই থই করচে। দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটি তরুণী সবেমাত্র স্নান করে উঠেছে, আর তার ভেজা পাতলা নীলাম্বরী শাড়ি ছাপিয়ে নিটোল উন্মুখ যৌবন ফুটে ফুটে বেরিয়েচে! এখনও ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করে ঝরছে। ঠিক যেন কোনো সুন্দরী তার একরাশ কালো কশকশে কেশ তোয়ালে দিয়ে ঝাড়চে, আর তারই সেই ভেজা চুলের ফিনকির ঝাপটা আমাদিগকে এমন ভিজিয়ে দিচ্চে! এখনও রয়ে রয়ে ক্ষীণ বিজুলি চমকে চমকে উঠেছে, ও বুঝি ওই সুন্দরের তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনের ললিত-চঞ্চল গতিরেখা! আর ওই যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু-চারটি গায়ক-পাখির ঈষৎ-ভেসে আসা গুঞ্জন শোনা যাচ্চে, ও বুঝি ওই স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু কিংবা বলয়-কাঁকনের শিঞ্জিনী! আর ওই যে তার শেফালির বোঁটায়-ছোবানো ফিরোজা রং-এর মলমলের মতো মিহিন শাড়ি আর তাতে ঘন-সবুজ-পাড় দেওয়া, ওতে যেন কে ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে! ও বোধ হয় আবিরও নয় ফাগও নয়, – কোনোও একজন বাদশাজাদা ওই তরুণীর ভালোবাসায় নিরাশ হয়ে ওই দুটি রাতুল চরণতলে নিজেকে বলিদান দিয়েছে আর তারই কলিজার এক ঝলক খুন ফিং দিয়ে উঠে, সুন্দরীর বাসন্তী-বসন অমন করে রক্ত-রঞ্জিত করে তুলেছে, – ওগো, তাই এ সাঁঝ বেলাতে সুন্দরীর মন এত ভারি! –

কেমন লাগল? দেখলি তো, আমি তোর মতো আর ছোটো কবি নই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় রে নূরু, যে, কেউ আমায় চিনতে পারলে না! পরে কিন্তু দেশের লোককে পস্তাতে হবে, বলে রাখচি। তুই হয়তো হাসচিস, কিন্তু আমি বলি কী, তার একটা মস্ত কারণ আছে। রবিবাবুকে ইয়োরোপ আর আমেরিকার লোক যে রকম বড়ো আর উঁচু করে দেখে, আমাদের দেশে সে রকম পারে কি? উলটো, যাঁরা তাঁর লেখার এক কানা-কড়িও বোঝেন না, তাঁরাই আবার যত রকমে পারেন তাঁর নিন্দা করেন যেন এইসব সমালোচক রবি-কবির চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়, তবে

তাঁরা সেটা দেখাতে চান না, আর দেখালেও নাকি দেশে কেউ সমঝদার নেই! এঁরাই কিন্তু মনে মনে রবিবাবুর পায়ে লক্ষ-হাজার বার সালাম না করে থাকতে পারেন না, তবু বাইরে নিন্দে করবেনই। কাজেই এসব লোককে সমালোচক না বলে আমি বলি পরশ্রীকাতর। এর একটা আবার কারণও আছে; আমরা দিন-রাত্তির ওঁকে চোখের সামনে দেখছি, – আর যাঁকে হরদম দেখতে পাওয়া যায়, এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার ‘মশহুর’ একজন লোক হবেন, এ আমরা সইতে পারিনে। তাই, অধিকাংশ কবিই জীবিতকালে শুধু লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনাই ভোগ করেছেন। ধর, আমার লেখা যদি ছাপার অক্ষরে বেরোয়, তবে অনেকেই ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যাবে। কারণ, আমারও তাদেরই মতো দুটো হাত দুটি পা। কোনো একটা অতিরিক্ত অঙ্গ, অন্তত পেছনে একটা লেজুড়ও নেই, – যার থেকে আমি একটা এরকম অস্বাভাবিক জানোয়ারে পরিণত হতে পারি! – একদিনকার একটা মজা শোন! একটা উচ্চ মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা একটা গল্প প্রকাশিত হতে দেখে আমার এক বন্ধু ভয়ানক অবাক হয়ে আর চটে বলেছিলেন –“আরে মিয়াঁ, হঃ! আমি না কইছিলাম যে, এসব কাগজ লইতাম না? এইসব ফাজিল চ্যাংরারা যাহাতে ল্যাহে, হেই কাগজ না আবার মান্‌ষে পড়ে? আমার চারড্যা ট্যাহা না এক্কেবারে জলে পরলনি!”

যাক, সৈনিক জীবন কেমন লাগছে? ও জীবন আমার মতো নরম চামড়ার লোকের পোষায় না রে ভাই, তোর মতো ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!

তুই শুনে খুব খুশি হবি যে, যে-লোকগুলো তোর মতো এমন ‘ধড়ফড়ে’ ইব্‌লিশ ছোকরাকে দু-চোখে দেখতে পারত না, তারাও এখন তোকে রীতিমতো ভয়-ভক্তি করে। তবে তাঁরা এটাও বলতে কসুর করেন না যে, তোদের মতো মাথা-খারাপ শয়তান ছোকরাদেরই জন্যে এ বঙ্গবাহিনীর সৃষ্টি।

তারপর একটু খুব গুপ্ত কথা। – বুবু সাহেবা আমায় ক্রমাগত জানাচ্ছেন যে, যদি আমার ওজর-আপত্তি না থাকে, তাহলে শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের (ওরফে তাঁর

ননদের) পাণিপীড়ন ব্যাপারটা আমার সঙ্গেই সম্পন্ন করে দেন। ওরকম একটা খোশখবর শুনে আমার খুবই 'খোশ' হওয়া উচিত ছিল, কেননা তাহলে রবিয়ল মিয়াঁকে খুব জব্দ করা যেত। তিনি আমার ভগ্নিকে বিয়ে করে আইনমতে আমায় শালা বলবার ন্যায্য অধিকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্তির দিন ভদ্র-অভদ্র লোকের মজলিসে মহ্‌ফিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিতান্ত নিরীহ প্রাণীরও তাতে আপত্তি করবার কথা। খুব ঘনিষ্ঠ আর সত্যিকার মধুর সম্বন্ধ হলেও লোকে 'শালা আর শ্বশুর' এই দুটো সম্বন্ধ স্বীকার করতে স্বতই বিষম খায়, এ একটা ডাহা সত্যি কথা! অতএব আমিও জায়বদ্‌লি বা □□□□□□□□□ স্বরূপ তাঁর সহোদরার পানিপীড়ন করলে তাঁর বিষদাঁত ভাঙা যাবে নিশ্চয়ই, তবে কিনা সেই সঙ্গে আমারও 'তিন পাঁচে পঁচাত্তর" দাঁত ভাঙা যাবে। কেননা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আমার ভবিষ্যৎ অঙ্কলক্ষ্মীটি আদৌ গো-বেচারি প্রিয়ভাষিণী নন, বরং তাতে লক্ষ্মীমেয়ের কোনো গুণই বর্তে নাই। সবচেয়ে বেশি ভয়, ইনি আবার ভয়ানক বেশি সুন্দরী, মানে এত বেশি সুন্দরী, যাদের 'চরণতলে লুটিয়ে পড়িতে চাই' বা 'জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই' আর কী! যাদের ঈষৎ আড়চোখো চাউনিতে আমাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়। যাদের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখে আমরা আনন্দে অস্বাভাবিক রকমের বদন ব্যাদান করে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ি! – আজকাল ওই ঘোড়া-রোগেই গরিব কাঁচা যুবকগুলো মরছে কিনা! – আর নূরু! লাজের মাথা খেয়ে সত্যি কথা বলতে কী ভাই, অহম্ গরিব নাবালকও ওই রোগেই মরেছে রে ওই রোগেই ম – রে – ছে! জানি না আমার কপালে শেষ পর্যন্ত কী আছে, – মুড়ো ঝ্যাঁটা, না মিষ্টি ঠোনা!

তোর মত কী? কী বলিস – দেবো নাকি চোখ-মুখ বন্ধ করে বিয়েটা...? (আঃ একটু ঢোক গিলে নিলুম রে!)

বাড়িতে বাস্তবিকই সকলে বড্ড মুষড়ে পড়েছেন তোর এই চলে যাওয়াতে। আমাদের গ্রামটায় প্রবাদের মতো হয়ে গিয়েছিল যে, তোর আর আমার মতো এমন সোনার চাঁদ ছেলে আর এমন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লোকে নাকি আর কখনও

দেখেনি। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে পড়তে যাওয়া, এক সঙ্গে বাড়ি আসা, ওঃ, সে কথাগুলো জানাতে হলে এমন ভাষায় জানাতে হয়, যে ভাষা আমার আদৌ আয়ত্ত নয়। ওরকম 'সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলসংযোগে' বা 'ক্ষিত্যপ্‌তেজো পটাক দুম্' ভাষা আমার একেবারেই মনঃপূত নয়। পড়তে যেন হাঁপানি আসে আর কাছে অভিধান খুলে রাখতে হয়! অবিশ্যি, আমার এ মতে যে অন্য সকলের সায় দিতে হবে, তারও কোনো মানে নেই। আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক, এমনকী অনেকে একে 'ফাজলামি' বা 'বাঁদরামি' বলেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু আমার এ হালকা ভাবের কথা – হালকা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি। তার ওপর, চিঠির ভাষা এর চেয়ে গুরুগম্ভীর করলে সেও একটা হাসির বিষয় হবে বই তো নয়! – যাক, কী বলছিলাম? এখন যখন আমি একা তাঁদের বাড়ি যাই, তখন বুবু সাহেবা আর কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারেন না। তাঁর যে শুধু ওই কথাটাই মনে পড়ে, এমনি ছুটিতে আমরা দুজনে বরাবর একসঙ্গে বাড়ি এসেছি। তারপর যত দিন থাকতাম, ততদিন বাড়িটাকে কীরকম মাথায় করেই না রাখতাম?...

হাঁ, আমাদিগকে যে লোক 'মোল্লা, দোপেঁয়াজা' বলে ঠাট্টা করত, তুই চলে যাওয়ার পর কিন্তু সব আমায় স্রেফ 'একপেঁয়াজা মোল্লা বলছে।

যাক ওসব ছাইপাঁশ কথা – নূরু, কত কথাই না মনে হয় ভাই, কিন্তু বড়ো কষ্টে হাসি দিয়ে তোরই মতো তা ঢাকতে চেষ্টা করি!...আবার কি আমাদের দেখা হবে?

পড়াশুনায় আমার আর তেমন উৎকট ঝোঁক নেই। আর কিছুতে মন বসে না। যাই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ইতি –

কলেজ-ক্লান্ত
মনুয়র

সালার
৬ই ফাল্গুন

সূচিপত্র

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

ভাই নূরুল হুদা, আমার শত স্নেহাশিস জানবে। অনেকদিন চিঠি দিতে পারিনি বলে তুমি তোমার ভাইসাহেবের পত্রে অনুযোগ করে বেশ একটু খোঁচা দিয়েছ। কী করি ভাই, সংসারের সব ঝক্কি এখন আমার ওপর। তুমি তো সব জান, আম্মাজান কিছু দেখেন না। আগে বরং দু-এক সময় তিনি বিষয়-আশয়ের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে দুটো উপদেশ দিতেন। এখন তাও বন্ধ। দিন-রাত নমাজ-রোজা নিয়ে নিজের ঘরটিতে আবদ্ধ, আর বাইরে এলেই ওঁর ওপর খুকির তখন ইজারা দখল!

তারপর তোমার ভাইসাহেবের কথা আর বোলো না। দিনে-রাত্তিরে 'কমসে কম' পঁচিশ কাপ চা গিলচেন আর বই নিয়ে, না হয় এসরাজ নিয়ে মশগুল আছেন। ওইসব বলতে গেলেই আমি হই 'পাড়া-কুঁদুলি, রণচণ্ডী, চামুণ্ডা' আর আরও কত কী! আমার মতো এই রকম আর গোটা কতক সহধর্মিণী জুটলেই নাকি স্বামীস্বত্বে স্বত্ববান বাংলার তাবৎ পুরুষপালই জব্দ হয়ে যাবেন। কপাল আমার! তা যদি হয়, তাহলে বুঝি যে একটা মস্ত ভালো করা গেল। এ দেশের মহিলারা যখন সহধর্মিণীর ঠিক মানে বুঝতে পারবেন, স্বামীর দোষকে উপেক্ষা না করে তার তীব্র প্রতিবাদ করে স্বামীকে সৎপথে আনতে চেষ্টা করবেন, তখনই ঠিক স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হবে। স্বামীকে আশকারা দিয়ে পাপের পথে যেতে দেয় যে স্ত্রী, সে আর যাই হোক, সহধর্মিণী নয়। যাক ওসব কথা, এখন আমার ইতিহাসটা শোনো, আর বলো আমি কী করে কোন্ দিক সামলাই। –সাংসারিক কোনো কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাইসাহেবের ভয়ানক মাথা দপ দপ করে, আর যে কাজেই (য) দু-তিন কাপ টাটকা চায়ের জোগাড় করতে হয়! চা-টা যদি একটু ভালো হল, তবে আর যায় কোথা? একেবারে দিল-দরিয়া মেজাজ! আরাম-কেদারায় সটান শুয়ে পড়েন, আর যা বলব তাতেই 'হুঁ'। তোমার সদাশিব কথাটা ভয়ানকভাবে খেটেছে ওঁর ওপর। কিন্তু ভাই, এতে তো আর সংসার চলে না। বিষয়-আশয় জমিদারি সব ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাং-খাওয়া বাবাজির মতো বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে কি সব ঠিক থাকে, না কাজেরই তেমনি শৃঙ্খলা হয়? মাথার উপর মুরুব্বি থাকাতে যতদিন যা করেছেন সেজেছে। আমি তো হদ্দ হলাম বলে বলে। কতই

আর প্যাঁচা-খ্যাঁচরা করব মানুষকে। একটু বুঝিয়ে বলতে গেলেই মুখটি চুন করে আস্তে আস্তে সেখান হতে সরে পড়া হয়। সেদিনের মতোই একেবারে গুম। সন্ধে নাগাদ আর টিকিটির পর্যন্ত দেখা নাই। আমি তো নাচার হয়ে পড়েছি ওঁকে নিয়ে। পড়তেন জাহাঁবাজ মেয়ের হাতে, তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চাল। তুমি যতদিন ছিলে, ততদিন যা এক আধটু কাজকর্ম দেখতেন। তুমি যাওয়ার পর থেকেই উনি এরকম উদাসীনের মতো হয়ে পড়েছেন। – আর তুমিই যে অমন করে চলে যাবে, তা কে জানত ভাই? – আজ আমি সন্তানের জননী, সংসারের নানান ঝঞ্ঝাট আমারই মাথায়, কাজেই চিন্তা করবার অবসর খুব কমই পাই; তবুও ওই হাজার কাজেরই হাজার ফাঁকে তোমার সেই শিশুর মতো সরল শান্ত মুখটি মনে পড়ে আমায় এত কষ্ট দেয় যে, সে আর কী বলব! আজ চিঠি লিখতে বসে কত কথাই না মনে পড়ছে। –

আমি যখন প্রথম এ ঘরের বউ হয়ে আসি, তখন ঘরটা কি-জানি কেন বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা বলে বোধ হত। ঘরে আর কেউ ছেলে-মানুষ ছিল না যে কথা কয়ে বাঁচি। আমাদের সোফি আর পাশের বাড়ির মাহ্‌বুবা তখনও নেহাত ছেলেমানুষ, আর সহজে আমার কাছও ঘেঁষত না। কে নাকি তাহাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আমি মেমসাহেব!সে কত কষ্টে তাহাদের ভয় ভাঙাতে হয়েছিল।...তারপর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তোমার ভাইসাহেব তোমায় আবিষ্কার করে ধরে আনলেন। তুমি নাকি তখন স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াতে। টোটো সন্ন্যাসী বা দরবেশগোছের কিছু হবে বলে, মাথায় লম্বা চুলও রেখেছিলে; মাঝে মাঝে আবার গেরুয়া বসন পরতে। এইসব অনেক-কিছু কারণে তোমার ভাইসাহেব তোমাকে একজন মহাপ্রাণ মহাপুরুষের মতোই সমীহ করলেও আমি একদিন বলেছিলাম যে, এসব হচ্ছে আজকালকাল ছোকরাদের উৎকট বাজে ঝোঁক আর অন্তঃসারশূন্য পাগলামি। তবে লম্বা চুল রাখবার একটা গূঢ় কারণ ছিল, – সে হচ্ছে, তুমি একজন 'মোখ্‌ফি' কবি; আর কবি হলেই লম্বা চুল রাখতে হবে। অবশ্য এ আমি তোমার লুকানো কবিতার খাতা দেখে বলছি তা মনে কোরো না। – তবে তুমি বলতে পার যে, তোমার উদাসীন হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তোমার বাপ-মা সবাই মারা পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত স্নেহ-বন্ধনই কালের আঘাতে ছিন্ন

হয়ে গেল। কিন্তু সত্য বলতে গেলে এসবের পেছনে কি আর একটা নিগূঢ় বেদনা লুকানো ছিল না, ভাই? আগেও আমার ছোটো ভাই মনুর কাছে শুনেছিলাম। তোমাতে আর মনুতে যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তাও ওরই মুখে শুনেছিলাম। তবে সে তোমার যেসব গুণের কথা বলত, তাতে স্বতই লোকের মনে হবার কথা যে, এ ধরনের জীবের বহরমপুরই উপযুক্ত স্থান। কয়েকবার বিপন্নকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলে, এমন কথা শুনেও আমি বলেছিলাম, ওসব রক্তগরম তরুণদের খামখেয়ালি ফ্যাশন। ওর সঙ্গে একটা উৎকট যশোলিপ্সাও যে আছে, তাও আমি অসংকোচে বলতাম। কিন্তু যেদিন তোমার ভাইসাহেব আর আমার ছোটো ভাইটির সাথে আমাদের ঘরে অসংকোচে নিতান্ত আপন জনের মতো এসে তুমি দাঁড়ালে, তখন বাস্তবিকই এক পলকে আমার ওসব মন্দ ধারণাগুলো একেবারে কেটে গেল। তোমার ওই নির্বিকার ঔদাস্যের ভাসা ভাসা করুণ কোমল দৃষ্টি আর শিশুর মন, অনাড়ম্বর সহজ সরল ব্যবহার দেখে আপনি তোমার ওপর একটা মায়া জন্মে গেল। আর যারা নিজেদের প্রতি এরকম উদাসীন, তাদের প্রতি মায়া না হয়েই যে পারে না। তাই সেদিন আমার বাপ-মা-মরা অনাথ ছোটো ভাইটির সাথে তোমাকেও আমার আরও একটি ছোটো ভাই বলে ডেকে নিলাম।...

তোমার সরল অট্টহাস্যে এই ঘর একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল; – গল্পের রহস্যালাপের তোড়ে এই ফাঁকা ঘরকেই তুমি মজলিশের মতো সরগরম করে তুলেছিলে, – সেই ঘর আজও আছে; তবে, তেমনি ফাঁকা! অনাবিল ঝরনাধারার মতো উদ্দাম হাসির ধারায় সে ঘরকে কেউ আর বিকৃত করে না, তাই সে নীরব-নিঝুম এক ধারে পড়ে আছে। আমাদেরও কেউ আর তেমন অনর্থক উৎপাতের জুলুমে তেতো-বিরক্ত করে তোলে না, তেমন-উন্মাদ হট্টগোলে বাড়িকে মাথায় করে তোলে না, তাই আমাদেরও কাজে আর সে প্রাণ সে উৎসাহ নেই! সব যেন মন-মরা! ফাগুন বনের বুকভরা দুষ্টুমির চপলতা যেন অসম্ভাবিত রূপে আসা পৌষের প্রকোপে একেবারে হিম হয়ে গেছে! – এইরকম বিরক্ত হওয়াতেও যে একটা বেশ আনন্দ পাওয়া যেত এ-তো অস্বীকার করতে পাবে না।

আচ্ছা ভাই নূর! তুমি কেন এমন করে আমাদের না বলে কয়ে চলে গেলে? অবিশ্যি, আমাদের বললে হয়তো সহজে সম্মতি দিতাম না, কিন্তু যদি নিতান্তই জোর করতে আর আমরা দেখতাম যে, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা সত্যিকার মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ, তাহলে আমরা কি এতই ছোটো যে তোমায় বারণ করে রাখতাম? তোমার গৌরবে কি আমাদেরও একটা বড়ো আনন্দ অনুভব করবার নেই?

তোমার ভাইসাহেব সদাসর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন, – তুমি কখন কী করে বস এই ভেবে; এই নিয়ে আমি কতদিন তাঁকে ঠাট্টা করেছি, এখন দেখছি, ওঁরই কথা ঠিক হল।

তুমি তোমার প্রাণের অনাবিল সরলতা আর প্রচ্ছন্ন-বেদনা দিয়ে যে সকলকে কত বেশি আপনার করে তুলেছিলে, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারনি। তুমি যে অনবরত হাসির আর আনন্দের সবুজ রং ছড়িয়ে প্রাণের বেদনা-অরুণিমার রক্তরাগকে লুকিয়ে রাখতে আর তলিয়ে দিতে চাইতে, এটা আমার কখনও চক্ষু এড়ায়নি। তাই তোমার এই হাসিই অনেক সময় আমায় বড়োই কাঁদিয়েছে। তোমার ওই ঘোর-ঘোর চাউনিতে যে বেদনার আভাস ফুটে উঠত, সে যে সবচেয়ে অরুন্তুদ! – মা-র মতো গম্ভীর লোকও তুমি চলে যাবার পর কত অঝোর নয়নে কেঁদেছেন। তোমার ভাই তো পাথরের মতো হয়ে পড়েছিলেন। খুকি পর্যন্ত কেমন 'হেদিয়ে' গিয়েছিল।

তোমার ভাই বেচারা এখনও আক্ষেপ করে বলেন, – 'হয়তো আমাদের দোষেই নূরু আমাদের ছেড়ে গেল!' কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। কেননা সেরকম কিছু তো কোনোদিন ঘটেনি। সত্যি বটে, তুমি অতি অল্পতেই রেগে উঠতে, কিন্তু সেটাকে রাগ বললে ভুল বলা হবে। ওটাকে রাগ না বলে সোজা কথায় বলা উচিত খেপে ওঠা; ঠিক যেন ঘাড়ের ঘুমন্ত একটা ভূতের ঝাঁ করে একটা মাথা নাড়া দিয়ে ওঠা, কাজেই ওতে না রেগে আমরা আমোদই পেতাম বেশি। একটা খ্যাপা লোককে খেপিয়ে যে কত আমোদ, তা যারা খ্যাপাতে জানে তারাই বোঝে। তোমার

স্কন্ধবাসী ভূত মহাশয়কে খুঁচিয়ে তাতিয়ে তোলা তাই এত বেশি উপভোগের জিনিস ছিল আমাদের। তবে 'উনি' যে তোমায় একটা আবছায়া বলে উপহাস করেন, সেইটাই সত্যি না কি?

আমায় বড়ো বোন বলে ভাবতে, তাই তোমার দুটি হাত ধরে অনুরোধ করছি, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোমার সব কথা লিখে জানাবে কি? যেসব কথা নিতান্ত আপত্তিকর বা গোপনীয় যেসব কথা আমি আন্দাজেই বুঝে নেব, তোমায় স্পষ্ট করে খুলে লিখতে বলছি নে। মেয়েদের বিশ্বাসঘাতক বলে বদনাম থাকলেও আমি কথা দিচ্ছি যে, তোমার কোনো কথা কাউকে জানাব না। বড়ো বোনের ওপর এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার কি?

এখন আমাদের সোফিয়া মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে দু-একটা কথা তোমায় জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি, বিরক্ত হোয়ো না বা রাগ কোরো না। – লক্ষ্মীটির মতো তখন যদি তাকে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী করে নিতে, তবে বেচারিদের আজ এত কষ্ট পেতে হত না। তুমি জান, একে বেচারিদের অবস্থা ভালো ছিল না, – বিপদের উপর বিপদ – সেদিন তার বাবাও আবার সাতদিনের জ্বরে মারা গেছেন। এক মামারা ছাড়া তো তাদের খোঁজ-খবর নেবার কেউ ছিল না দুনিয়ায়, তাই তারা এসে সেদিন মাহ্‌বুবাদের সবকে নিজের ঘরে নিয়ে গেছেন। এত বুঝালাম, অনুরোধ করলাম আমরা, এমনকী পায়ে পর্যন্ত ধরেছি – কিন্তু মাহ্‌বুবার মা কিছুতেই এখানে আমাদের বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না। থাকবেনই বা কী করে? তুমিই তো ওঁদের এ-দেশ ছাড়ালে! যে অপমান তুমি করেছ ওঁদের, যে আঘাত দিয়েছ ওঁদের বুকে, যেরম প্রতারিত করেছ ওঁদের আশালুব্ধ মনকে, তাতে অবস্থাপন্ন লোক হলে তোমার ওপর এর রীতিমতো প্রতিহিংসা না নিয়ে ছাড়তেন না। তাঁদের অবমাননা-আহত প্রাণের এই যে নীরব কাতরানি, তা যদি সবার বড়ো বিচারক খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছে তাহলে তার যে ভীষণ অমঙ্গল-বজ্র তোমার আশে-পাশে ঘুরবে, তা ভেবে আমি শিউরে উঠছি, আর দিন-রাত খোদাতায়ালার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করছি। এই মাহ্‌বুবার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, এতে আমরা বলব, তাঁর হায়াত ছিল না – কে বাঁচাবে; কিন্তু লোকে বলছে, তোমার হাতের এই

অপমানের আঘাতই তাঁকে পাঁজর-ভাঙা করে দিয়েছিল। আর বাস্তবিক, ওঁরা তো কেউ প্রথমে রাজি হননি বা বড়ো ঘরে বিয়ে দিতে আদৌ লালায়িত ছিলেন না, আমিই না হাজার চেষ্টা-চরিত্তির করে সম্‌ঝিয়ে ওঁদের রাজি করি। তোমার ভাইসাহেব কিন্তু প্রথমেই আমায় 'বারহ' মানা করেছিলেন – শেষে একটা গণ্ডগোল হওয়ার ভয়ে, কিন্তু আমি তা শুনিনি। আমি সে সময় এমন একটা ধারণা করেছিলাম, যা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তুমি হাজার অস্বীকার করলেও আমি জোর করে বলতে পারি যে, মাহ্‌বুবাকে দেখে তুমি নিজেও মরেছিলে আর তাকেও মিথ্যা আশায় মুগ্ধ করে তার নারী-জীবনটাই হয়তো ব্যর্থ করে দিলে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে মেলামেশা এমনকী দেখাশুনা পর্যন্ত ঘটেনি, এ আমি খুব ভালো করে জানি, কিন্তু ওই যে পরের জোয়ান মেয়ের দিকে করুণ-মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকা, তার মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা-কেরদানি দেখানো, এ-সব কীজন্য হত? এগুলো তো আমাদের চোখ এড়ায়নি! খোদা আমাদেরও দু-দুটো চোখ দিয়েছেন, এক-আধটু বুদ্ধিও দিয়েছেন। আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, আমি বড্ড বুকভরা স্নেহ দিয়েই তোমাদের এ পূর্বরাগের শরম-রঙিন ভাবটুকু উপভোগ করতাম, কারণ আমি জানতাম দু-দিন বাদে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হতে যাচ্ছ, আর তাই আমাদের সমাজে এ পূর্বরাগের প্রশ্রয় নিন্দনীয় হলেও দিয়েছি। নিন্দনীয়ই বা হবে কেন? দুইটি হৃদয় পরস্পরকে ভালো করে চিনে নিয়ে বাসা বাঁধলেই তো তাতে সত্যিকার সুখ-শান্তি নেমে আসে! যেমন আকাশের মুক্ত পাখিরা। দেখেছ তাদের দুটিতে কেমন মিল? তারা কেমন দুজনকে দুজন চিনে নিয়ে মনের সুখে বাসা বাঁধে, ঘরকন্না করে। এ দেখে যার চোখ না জুড়ায়, সে পাষাণ, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হিংসুক। হৃদয়ের এ অবাধ পরিচয় আর মিলনকে যে নিন্দনীয় বলে, সে বিশ্ব-নিন্দুক। যাক সেসব কথা, কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে বাঁশির সুরে একটি কিশোরী হরিণীকে কাছে এনে তাকে জালিমের মতো এমন আঘাত করলে! এইখানেই তোমাকে ছোটো ভাবতে আমার মনে বড্ড লাগে! এর মূলে কি কোনো বেদনা কি কোনো-কিছু নিহিত নাই? ধরো, এতে আমার যে অপমান করেছ তা নয়তো স্নেহের অনুরোধে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অন্যে সে অপমান সইবে কেন? তাদের তো তার অধিকার দাওনি! আর তোমার যদি বিয়ে করবার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, তবে প্রথমে কী ভেবে – কীসের মোহে পড়ে রাজি

হয়েছিলে? আবার রাজি হয়ে, যখন সব ঠিকঠাক – তখনই বা কেন এমন করে চলে গেলে? গরীব হলেও তাঁদের বংশমর্যাদা অনেক উচ্চ, এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল।

কিছু মনে কোরো না। বড্ড বুক তোলপাড় করে উঠল, তাই উত্তেজিত হয়ে হয়তো অনেক কর্কশ কথা লিখলাম। তোমার ওপর আমার স্নেহের দাবি আছে বলেই এত কথা এত জোর করে কঠিনভাবে বলতে পারলাম। তাছাড়া বরাবরই দেখেছ আমি একটু অন্য ধরনের মেয়ে। যা সত্যি, অপ্রিয় হলেও তা বলতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হই না। যাকে স্নেহ করি, তার অন্যায়টাই বুকে সবচেয়ে বেশি বাজে।

সোফিয়ার চেয়েও মাহ্‌বুবার ওপর আমার বেশি মায়া জন্মে গেছিল। মেয়েটা যেমন শান্ত তেমনই লক্ষ্মীমেয়ের সমস্ত গুণই তাতে বর্তেছিল। তাছাড়া দরিদ্রতার করুণ সসংকোচ ছায়াপাতে তার স্বভাবসরল সুন্দর মুখশ্রী আরও মর্মস্পর্শী মধুর হয়ে ফুটে উঠত আমার কাছে। সে যেদিন চলে গেল, সোফি সেদিন ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল, তিন চার দিন পর্যন্ত তাকে এক ঢোক পানি পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি, – একেবারে যেন মরবার হাল! মা-ও না কেঁদে পারেননি। আহা, পোড়াকপালিকে কি আজ এমন করে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হত, যদি তুমি তার সোনার স্বপন এমন করে ভেঙে না দিতে। অভাগি যাবার দিনে আমার গলাটা ধরে কী কাঁদাই না কেঁদেছে! তার দু-চোখ দিয়ে যেন আঁশুর দরিয়া বয়ে গিয়েছে! আর একদিন সে কেঁদেছিল ভাই, লুকিয়ে এমনই গুমরে কেঁদেছিল, যেদিন তুমি যুদ্ধে চলে যাও! – আমার বুক ফেটে কান্না আসচে, এ হতভাগির পোড়াকপাল মনে করে। ...সে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, সুতরাং তার মামুরা যে তাকে আর থুবড়ো রাখবে তা তো মনে করতে পারিনে, বা ও নিয়ে জোর করেও কিছু বলতে পারিনে। বোধ হয় ওইখানেই কোথাও দেখেশুনে বে-থা দেবে। তাঁদের অবস্থা খুব সচ্ছল হলেও বড্ড কৃপণ, – নাকি পিঁপড়ে চিপে গুড় বের করে। তাই বড়ো দুঃখ আর ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করছে। বানরের গলায় মুক্তোর মালার মতো ও হতচ্ছাড়ি কার কপালে পড়ে, কে জানে! গরিব ঘরের মেয়ে হলেও সে আশরফ ঘরের – তাতে অনিন্দ্যসুন্দরী, ডানাকাটা পরি বললেই হয়, – তার ওপর মেয়েদের যেসব

গুণ থাকা দরকার, খোদা তাকে তার প্রায় সমস্তই ডালি ভরে দিয়েছেন। আমিও তাকে সাধ্যমতো লেখাপড়া, বয়নাদি চারুশিল্প, উচ্চশিক্ষা – সব শিখিয়েছি। কেন এত করেছিলাম! আমার খুবই আশা ছিল, তার রূপগুণের ফাঁদে পড়ে তোমার মতন সোনার হরিণ ধরা দেবে, তোমার এই লক্ষ্যহীন, বিশৃঙ্খল বাঁধনহারা জীবনের গতিও একটা শান্ত সুন্দরকে কেন্দ্র করে সহজ স্বচ্ছন্দ ছন্দে বয়ে যাবে, – পাশের মাঠে সবুজ শ্যামলতার সোনার স্মৃতি রেখে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, খোদা করেন আর! কারুর দোষ নেই ভাই, দোষ ওরই পোড়াকপালের – আর সবচেয়ে বেশি দোষ আমার।

মানুষ শেখে দেখে, নয়তো ঠেকে। আমি জীবনে মস্ত একটা ভুল করতে গিয়ে দস্তুরমতো শিক্ষা পেলাম। নানান দেশের রকমের গল্প উপন্যাস পড়ে আমার একটা গর্ব হয়েছিল যে, লোকচরিত্র বুঝবার আমার অগাধ ক্ষমতা, কিন্তু আমার সকল অহংকার চোখের জলে ডুবে গেল।

যাক, তোমায় অনেক বকলাম ঝকলাম, অনেক উপদেশ দিলাম, অনেক আঘাত করলাম, তাই শেষে একটা খোশখবর দিচ্ছি, অবিশ্যি সেটার সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যায়নি, তবে কথায় আছে, 'খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা!' কথাটা আর কিছু নয়, – আমার হাড়-জ্বালানো ননদিনি শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের বিয়ে – বিয়ে বিয়ে! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভবদীয় সখা, শ্রীমান মনুয়রের সঙ্গে! বুঝেছ? মনুর বি. এ. পরীক্ষার ফলটা বেরুলেই শুভ কাজটা শিগগির শিগগির শেষ করে দেব মনে করছি। এবার মনুর দু-দুটো বি.এ পাশ। কথাটা হঠাৎ হল ভেবে তুমি হয়তো অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে অবাক হবার কিছুই নেই, অনেকদিন থেকেই ওটা আমরা ভিতরে ভিতরে সমাধান করে রেখেছিলাম এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ সতর্ক হয়েছিলাম যাতে কথাটা তোমাদের দুই ফাজিলের একজনেরও কানে গিয়ে না ঢোকে। কারণ তুমি আর মনু এই দুটি বন্ধুতেই এত বেশি বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছিলে যে, অনেকে শয়তানের ভাইরাভাই বলতেও কসুর করত না। এই বিয়ের কথাটা তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে তোমরা যে প্রকাশ্যেই ওই কথাটা নিয়ে বিষম আন্দোলন আলোচনা লাগিয়ে দিতে, তাতে কোনোই সন্দেহ

নেই। আগে নাকি ছেলেরা মুরুব্বিদের সামনে বিয়ের কথা নিয়ে কখনও 'টুঁ পর্যন্ত করতে সাহস করত না, কিন্তু আজকালকার দু-পাতা 'ইঞ্জিরি'-পড়া ইঁচড়ে পাকা ডেঁপো ছেলেরা গুরুজনের নাকের সামনে তাদের ভাবী অর্ধাঙ্গিনীর রূপ-গুণ সম্বন্ধে বেহায়ার মতো 'কাঁকাল কোমর' বেঁধে তর্ক জুড়ে দেয় – এই হচ্ছে প্রাচীন-প্রাচীনাদের মত। ছিঃ মা, কী লজ্জা!

সোফিয়ার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সে বোধ হয় আজকাল দর্শন পড়ছে কিংবা অন্য কিছুতেই (?) পড়েছে। কেননা সে দিন দিন যেন কেমন একরকম উন্মনা হয়ে পড়ছে! তোমার দেওয়া 'উচ্ছল জলদল কলরব' ভাবটা তার আজকাল একেবারেই নেই। সে প্রায়ই গুরুগম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবে – আর ভাবে! তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, এই যা ভরসা। কেননা মেয়েরা অনেকেই বিয়ের আগে ওরকম একটু মন উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়ে থাকেন, এ আমাদের স্ত্রী-অভিজ্ঞতার বাণী। বিয়ের মাদকতা কী কম রে ভাই! হতভাগা তুমিই কেবল এ রসে বঞ্চিত রইলে! তাছাড়া দু-দিন বাদে যাকে দস্তুরমতো গিন্নিপনা করতে হবে, আগে হতেই তাকে এরকম গ্রাম্ভারি চালে ভবিষ্যতের একটা খসড়া চিন্তা করতে দেখে হাসা বা বিদ্রুপ করা অন্যায়, – বরং দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করাই ন্যায়সঙ্গত।

সোফিয়াকে সেদিন তোমায় চিঠি দেওয়ার জন্যে বলতে গিয়ে তো অপ্রতিভের শেষ হতে হয়েছে আমায়! আমার প্রস্তাবটা শুনে যে নাক সিঁটকিয়ে – একটা বিচিত্র রকমের অঙ্গভঙ্গি করে – মুখের সামনে মেম-সাহেবদের মতো চার-পাঁচ পাক ফর-ফর করে ঘুরে – দুই হাত নানান ভঙ্গিতে আমার নাকের সামনে নাচিয়ে একেবারে মুখ ভেঙচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল – 'আমার এত দায় কাঁদেনি –গরজ পড়েনি লোককে খোশামুদি করে চিঠি দিবার!' আমি তো একেবারে 'থ'! কথাটা কী জানো? – সে বড্ড বেশি অভিমানী কিনা, তাই এতটুকুতেই রেগে ট্যাসকণার মতো 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করে ওঠে। তুমি সবাইকে চিঠি দিয়েছ আর তাকেই দাওনি, এবং নাকি নেহায়েৎ বেহায়াপনা করে তার ভাইকে তার বিয়ে না ছাই-পাঁশ সম্বন্ধে কী লিখেছ, এই হয়েছে তার আসল রাগের কারণ। তুমি এখানে থাকলে হয়তো সে রীতিমতো

একটা কোঁদল পাকিয়ে বসত, কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখেই সে ভিতরে ভিতরে রাগে এমন গস্ গস্ করছে। এ সকলের সঙ্গে তার আরও কৈফিয়ত এই যে, তার হাতের লেখা নাকি এতই বিশ্রী এবং বিদ্যাবুদ্ধি এতই কম যে, তোমার মতো পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধুরন্ধর ব্যক্তির নিকট তা নিয়ে উপহাসাস্পদ হতে সে নিতান্তই নারাজ! এসব তো আছেই, অধিকন্তু তার মেজাজটাও নাকি আজকাল বহাল খোশ-তবিয়তে নেই – অবশ্য আমার মতো ছেঁদো, ছোটো, বেহায়া লোকের কাছে কৈফিয়ত দিলে তার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগবে বলে সে মনে করে! য়্যা আল্লাহ্! – কী আর করি ভাই! নাচার!! আমি ভালো করেই জানি যে, এর ওপর আর একটি কথা বললেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে; আমার চুল ছিঁড়ে, নুচে, খামচিয়ে, কামড়িয়ে গায়ে থুথু দিয়ে আমাকে এমন জব্দ আর বিব্রত করে ফেলবে যে তাতে আমি কেন, পাথরের মূর্তিরও বিচলিত হওয়ার কথা!

বাপরে বাপ! যে জবরদস্ত জালিম জাহাঁবাজ মেয়ে! – আমার তো ভয় হচ্ছে, মনু ওকে সামলাতে পারলে হয়।

অনেক লেখা হল। মেয়েদের এই বেশি বকা, বেশি লেখা প্রভৃতি কতকগুলো বাহুল্য জিনিস স্বয়ং ব্রহ্মাও নিরাকরণ করতে পারবেন না। আমরা মেয়েমানুষ সব যেন কলের জল বা জলের কল! একবার খুলে দিলেই হল!

যাক, যা হওয়ার ছিল, হয়েছে। এখন খোদা তোমায় বিজয়ী বীরের বেশে ফিরিয়ে আনুন, এই আমাদের দিন-রাত্তির খোদার কাছে মুনাজাত। যে মহাপ্রাণ, অদম্য উৎসাহ আর অসম সাহসিকতা নিয়ে তরুণ যুবা তোমরা সবুজ বুকের তাজা খুন দিয়ে বীরের মতো স্বদেশের মঙ্গল সাধন করতে, দুর্নাম দূর করতে ছুটে গিয়েছ, তা হেরেমের পুরস্ত্রী হলেও আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতা ভগিনীই বোঝেন, তাই আজ অনেক অপরিচিতার অশ্রু তোমাদের জন্যে ঝরছে। এটা মনে রেখো যে, পৌরুষ আর বীরত্ব সব দেশেরই মেয়েদের মস্ত প্রশংসার জিনিষ, সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষের ওই গুণটিই আমাদের বেশি আকর্ষণ করে! – অন্ধ স্নেহ-মমতা বড়ো কষ্ট দিলেও দেশমাতার ভৈরব আহ্বানে তাঁর পবিত্র বেদির সামনে এই যে তুমি হাসতে

হাসতে তোমার কাঁচা, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় প্রাণটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছ, এ গৌরব রাখবার ঠাঁই যে আমাদের ছোটো বুকে পাচ্চিনে ভাই! আজ আমাদের এক চক্ষু দিয়ে অশ্রুজল আর অন্য চক্ষু দিয়ে গৌরবের ভাস্বর জ্যোতি নির্গত হচ্চে!

খোদার 'রহম' ঢাল হয়ে তোমায় সকল বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করুক, এই আমার প্রাণের শেষ শ্রেষ্ঠ আশিস।

এখন আসি ভাই। খুকি ঘুম থেকে উঠে কাঁদচে! – শিগগির উত্তর দিয়। ইতি –

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী 'ভাবি'
রাবেয়া
শাহ্পুর

ঘ

১০ই ফাল্গুন
(নিঝুম রাত্তির)
ভাই সোফি!

অভিমানিনী, তুমি হয়তো এতদিনে আমার ওপর রাগ করে ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে, গুম হয়ে বসে আছ! কারণ আমি আসবার দিনে তোমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম যে গিয়েই চিঠি দেব। আমার এত বড়ো একটা চুক্তির কথা আমি ভুলিনি ভাই, কিন্তু নানান কারণে, বারো জঞ্জালে পড়ে আমায় এরকমভাবে খেলো হয়ে পড়তে হল তোমার কাছে। সোজাভাবেই সব কথা বলি – এখানে পৌঁছেই বোন, আমার যত কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেছে, কী এক-বুক অসোয়াস্তি যেন বেরোবার পথ না পেয়ে শুধু আমার বুক-জোড়া পাঁজরের প্রাচীরে ঘা দিয়ে বেড়াচ্চে। কদিন থেকে মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরচে আর মনে হচ্চে, সেই সঙ্গে যেন দুনিয়ার যতকিছু আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক রকম কান্না কাঁদচে, আর সেই অকরুণ কান্নার যতির মাঝে মাঝে একটা নির্মম জিনের কাঠ-চোটা বিকট হাসি উঠচে হো – হো – হো! সামনে তার নিঝুম গোরস্থানের মতো 'সুম-সাম' হয়ে পড়ে রয়েচে আমাদের পোড়ো-বাড়িটা। তারই জীর্ণ দেয়ালে অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা দাঁড়কাক বীভৎস গলাভাঙা স্বরে কাতরাচ্চে, 'খাঁ – আঃ! – আঃ!' দুপুর রোদ্দুরকে ব্যথিয়ে ব্যথিয়ে তারই পাশের বাজ-পড়া অশথ গাছটায় একটা ঘুঘু করুণ-কণ্ঠে কূজন কান্না কাঁদচে, 'এসো খুকু – উ – উ- উঃ!' বাদলের জুলুমে আমাদের অনেক দিনের অনেক স্মৃতি-বিজড়িত মাটির ঘরটা গলে গলে পড়চে, – দেখতে দেখতে সেটা একটা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেল – চারিধারে তার তেশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাগুল্মের ঝোপ-ঝাড়ু তাদের আশ্রয় করে ঘর বেঁধেচে বিছে, কেউটে সাপ, শিয়াল, খটাস, – ওঃ, আমার মাথা ঘুরচে, আর ভাবতে পারচিনে!... যখন মাথাটা বড্ড দপ দপ করতে থাকে আর তারই সঙ্গে এই বীরভূমের একচেটে করে-নেওয়া 'মেলেরে' জ্বর (ম্যালেরিয়ার আমি এই বাংলা নাম দিচ্চি!) হু-হু করে আসে, তখন ঠিক এই

রকমের সব হাজার এলোমেলো বিশ্রী চিন্তা ছায়াচিত্রের মতো একটার পর একটা মনের ওপর দিয়ে চলে যায়! আজ তাই ভাই সোফিয়া রে! বড়ো দুঃখেই বাবাজিকে মনে করে শুধু কাঁদচি – আর কাঁদচি! খোদা যদি অমন করে, তাঁকে আমাদের মস্ত দুর্দিনের দিনে ওপারে ডেকে না নিতেন, তা হলে কি আজ আমাদের এমন করে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পরের গলগ্রহ হয়ে 'অন্‌হেলা'র ভাত গিলতে হত বোন? আজ এই নিশীথ-রাতে স্তব্ধ মৌন-প্রকৃতির বুকে একা জেগে আমি তাই খোদাকে জিজ্ঞাসা করচি – নিঃসহায় বিহগ-শাবকের ছোট্ট নীড়খানি দুরন্ত বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর কী লাভ? 'পাক' তিনি, তবে একী পৈশাচিক আনন্দ রয়েচে তাঁহাতে? হায় বোন, কে বলে দেবে সে কথা?

তুই হয়তো আমার এসব 'পাকামো' 'বুড়োমি' শুনে ঝংকার দিয়ে উঠবি, "মাগো মা! এত কথাও আসে এই পনেরো ষোলো বছরের ছুঁড়ির! যেন সাতকালের বুড়ি আর কি!" কিন্তু ভাই, যাদের ছেলেবেলা হতেই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে মানুষ হতে হয়, যাদের জন্ম হতেই টাল খেয়ে খেয়ে, চোট খেয়ে খেয়ে বড়ো হতে হয়, তারা এই বয়সেই এতটা বেশি গম্ভীর আর ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে যে, অনেকের চোখে সেটা একটা অস্বাভাবিক রকমের বাড়াবাড়ি বলেই দেখায়। অতএব যে জিনিসটা জীবনের ভেতর দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করিসনি, সেটাকে সমালোচনা করতে যাস নে যেন। যাক ওসব কথা। ...

মা তাঁর বাপের বাড়ি বলে এখানে এসে এখন নতুন নতুন বেশ খুশিতেই আছেন। আমি জানি, তাঁর এ হাসি-খুশি বেশিদিন টিকবে না। তবুও কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। আমার মনে সুখ নেই বলে অন্যকেও কেন তার ভাগী করব? তাছাড়া চির-দুঃখিনী মা আমার যদি তাঁর শোকসন্তপ্ত প্রাণে এই একটুখানি পাওয়া সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ শুধু একটুক্ষণের জন্যেও পান, তবে তাঁর, মেয়ে হয়ে কোন্ প্রাণে তাঁকে সে আনন্দ হতে বঞ্চিত করব? এ-ভুল তো দু-দিন পরে ভাঙবেই আপনি হতে! – আর এক কথা, মায়ের খুশি হবার অধিকার আছে এখানে, কেননা এটা তাঁর বাপের বাড়ি। আর তারই উলটো কারণে হয়েচে আমার মনে কষ্ট। অবশ্য আমিও নতুন জায়গায় (তাতে মামার বাড়ি) আসার ক্ষণিক আনন্দ প্রথম দু-

একদিন অন্তরে অনুভব করেছিলাম, কিন্তু ক্রমেই এখন সে আনন্দের তীব্রতা কর্পূরের উবে যাওয়ার মতো বড়ো সত্বরই উবে যাচ্ছে। হোক না মামার বাড়ি, তাই বলে যে সেখানে বাবার বাড়ির মতো দাবি-দাওয়া চলবে, এ তো হতে পারে না। মানি, মামার বাড়ি ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয় আর লোভনীয় স্থান, কিন্তু যদি স্রেফ দু-চার দিনের মেহ্‌মান হয়ে শুভ পদার্পণ হয় সেখানে। যাঁরা মামার বাড়িতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে বা একটু বেশিদিনের জন্যে থেকেচেন, তাঁরাই একথার সারবত্তা বুঝতে পারবেন। অতিথিস্বরূপ দু-একদিন থেকে যাওয়াই সঙ্গত কুটুম বাড়িতে। আমি এখানে অতিথি মানে বুঝি যাঁদের স্থিতি বড়ো জোর এক তিথির বেশি হয় না। যিনি অতিথির এই বাক্যগত অর্থের প্রতি সম্মান না রেখে শার্দুলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি। আর, তাঁর ভাগ্যে সম্মানও ওই বাঘের মাসি বিড়ালের মতো চাটু আর হাতার বাড়ি, চেলাকাঠের ধুমসুনী! এঁরাই আবার অর্ধচন্দ্র পেয়ে চৌকাঠের বাইরে এসে, আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিয়ে বেইজ্জতির অজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মতো গরম করে গৃহস্বামীর ছোটোলোকত্বের কথা তারস্বরে যুক্তিপ্রমাণসহ দেখাতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতের কান্নাও কাঁদেন। আহা! লজ্জা করে না এসব বেহায়াদের? এ যেন ‘চুরি কে চুরি উলটো সিনাজুরি!’ থাক এসব পরের ‘গিল্লে’ -চর্চা, এখন বুঝলি, মেয়েদের এই ‘ধান-ভানতে শিবের গীত’ – এক কথা বলতে গিয়ে আরও সাত কথার অবতারণা করা আর গেল না। কথায় বলে ‘ খস্‌লৎ যায় মলে।’ – আমি বলছিলাম যে, আমার মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেউ যদি মামাদের ঘাড়ে ভর করে এসে বসে, তবে সেখানে সে বেচারির আবদার তো চলেই না, স্নেহ-আদরের ও দাবি-দাওয়ার একটা সপ্রতিভ অসংকোচ আর্জিও পেশ করা যায় না। একটা বিষম সংকোচ, অপ্রতিভ হওয়ার ভয়, সেখানে কালো মেঘের মতো এসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। যার ভেতরে এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সে কখনই এরকমভাবে ছোটো আর অপমানিত হতে যাবে না। ওই কী বলে না, ‘আপনার ঢিপেয় কুকুর রাজা।’ কুকুরের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যত বড়োই শত্রু হোক আর পেছন দিকে হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃততম স্থানে সংলগ্ন করুক, যদি একবার যো-সো করে নিজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবে আর যায় কোথা! আরে বাপরে বাপ! অমনি তখন তার বুক সাহসের চোটে দশ হাত ফুলে ওঠে। তাই তখন

সে তার নেজুড় যতদূর সম্ভব খাড়া করে আমাদের মর্দ বাঙালি পুরুষ-পুঙ্গবদেরই মতো তারস্বরে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও অবশ্যস্বীকার্য যে, এমন বীরত্ব দেখাবার সময়ও অন্তত অর্ধেক শরীর তার দোরের ভিতর দিকেই থাকে আর ঘনঘন দেখতে থাকে যে, তাড়া করলে 'খেঁচে হাওয়া' দেওয়ার মতো লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা। এই সারমেয় গোষ্ঠীর মতো আমাদের দেশের পুরুষদেরও এখন দুটি মাত্র অস্ত্র আছে, সে হচ্ছে ষাঁড় বিনিন্দিত কণ্ঠের গগনভেদী চিৎকার আর মূল্য-বিনিন্দিত বড়ো বড়ো দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিঁচুনি! তাই আমরা আজও মাত্র দুই জায়গায় বাঙালির বীরত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই; এক হচ্চে, যখন এঁরা যাত্রার দলে ভীম সাজেন, আর দুই হচ্চে, যখন এঁরা অন্দরমহলে এসে স্ত্রীকে ধুমসুনি দেন। হাঁ-হাঁ, আর এক জায়গায়, – যখন এঁরা মাইকেলি ছন্দ আওড়ান!... আর এঁরা এসব যে করতে পারেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁদের সে সময় মস্ত একটা সান্ত্বনা থাকে যে, যতই করি না কেন, এ হচ্চে 'হামারা আপনা ঘর!'

এইখানে আর একটা কথা বলে রাখি ভাই! আমার চিঠিতে এই যে কর্কশ নির্মম রসিকতা নীরসতা আর হৃদয়হীন শ্লেষের ছাপ রয়েচে, এর জন্যে আমায় গালাগালি করিসনে যেন। আমার মন এখন বড়ো তিক্ত – বড়ো নীরস –শুষ্ক। সেই সঙ্গে অব্যক্ত একটা ব্যথায় জান শুধু ছটফট করচে। আর কাজেই আমার অন্তরের সেই নীরস তিক্ত ভাবটার ও হৃদয়হীন ব্যথার ছটফটানির ছোপ আমার লেখাতে ফুটে উঠবেই উঠবে। – যতই চেষ্টা করি না কেন, সেটাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারব না। এরকম সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই দ্যাখ না, আমার মনে যখন যে ভাব আসচে বিনা দ্বিধায় অনবরত লিখে চলেচি, – কোথাও সংযম নেই, বাঁধন নেই, শৃঙ্খলা – 'সিজিল' কিচ্ছু নেই, – মন এতই অস্থির, মন এখন আমার এতই গোলমাল! –

হাঁ, মামার বাড়ির সকলে যেই জানতে পেরেচে যে, আমরা খাস-দখল নিয়ে তাঁদের বাড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো জড় গেদে বসেছি, অমনি তাঁদের আদর আপ্যায়নের তোড় দস্তুরমতো ঠান্ডা হয়ে গেছে! এটাও স্বাভাবিক। নতুন পাওয়ার

আনন্দটা, নতুন পাওয়ার জিনিসের আদর তত বেশি নিবিড় হয়, সেটা যত কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কারণ, নতুন ও হঠাৎ-পাওয়া আনন্দেরও একটা পরিমাণ আছে, আর সেই পরিমাণের তীব্রতাটা জিনিসের স্থিতির কালানুযায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে। যেটার স্থিতিকাল মাত্র একদিন, সে ওই আনন্দের সমগ্র তীব্রতা ও উষ্ণতা একদিনেই পায়। যেটা দশদিন স্থায়ী, সে ওই সমগ্র আনন্দটা দশদিনে একটু একটু করে পায়। আমি এখন এই কথাটার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝচি। কারণ, অন্য সময় যখন এখানে এসেচি, তখন এই বাড়ির সকলে উন্মুক্ত হয়ে থাকত কীসে আমাদের খুশি রাখবে, দিন-রাত ধরে এত বেশি আদর-সোহাগ ঠেসে দিত যে, তার কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকবার জো ছিল না। তাই তখন মামার বাড়ির নাম শুনলে আনন্দে নেচে উঠতাম। এখানে এসে দু-দিন পরে এখানটা ছেড়ে যেতেও কত কষ্ট হত! মামানি, নানি, মামু, খালাদের কোল থেকে নামতে পেতাম না। গায়ে একটু আঁচড় লাগলে অন্তত বিশ গন্ডা মুখে জোর সহানুভূতির 'আহারে! ছেলে খুন হয়ে গেল!' ইত্যাদি কথা উচ্চারণ হত! তাই বলে মনে করিসনে যেন যে, আজও আমি তেমনি করে কোলে চড়ে বেড়াবার জন্যে উসখুস করচি, এখন আমি আর সে কচি খুকি নই। এখানকার মেয়েমহলের মতে – একটা মস্ত থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে! এই রকম কত যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় দিনের মাথায়, তার আর সংখ্যা নেই। আর, যেখানকার পৌনে ষোলো আনা লোকের মুখে-চোখে একটা স্পষ্ট চাপা বিরক্তির ছাপ নানান কথায় কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেখানে নিজেকে কতটুকু ছোটো করে রাখতে হয়, জানটা কীরকম হাঁপিয়ে ওঠে সেখানে, ভাব দেখি! এই উপেক্ষার রাজভোগের চেয়ে যে ঘরের মাড়ভাত ভালো বোন! মামুজিরা আমায় খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু তাঁরা তো দিন-রাত্তির ঘরের কোণে বসে থাকেন না যে সব কথা শুনবেন। আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের! তার ওপর আবার এক এক জনের চাল এক এক রকমের। কেউ যান ছার্তকে, কেউ যান কদমে, কেউ যান দুলকি চালে। কথায় কথায় টিপ্পনী, কিন্তু মামুজিদের ঘরে দেখলেই আমাদের প্রতি তাঁদের নাড়ির টান ভয়ানক রকমের বেড়ে ওঠে, আমাদের পোড়া কপালের সমবেদনায় পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বা উনুনে কাঁচা কাঠ দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদেন! মামুজিরা বাইরে গেলেই আবার মনের ঝাল ঝেড়ে পূর্বের ব্যবহারের সুদসুদ্ধ আদায় করে নেন। আমি তো ভাই ভয়েই শশব্যস্ত।

সূচিপত্র

তাঁদের এক একটা চাউনিতে যেন আমার এক এক চুম্বন রক্ত শুকিয়ে যায়। দু-এক সময় মনে হয়, আর বরদাস্ত করতে পারিনে, সকল কথা খুলে বলি মামুজিদের, তারপর আমাদের সেই ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে যাই। কিন্তু এতটুকু টুঁ শব্দ করলেই অমনি রং-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ ঝংকার দিয়ে ওঠে। ঘরের আণ্ডাবাচ্চা মায় বাড়ির ঝি পুঁটি বাগদি পর্যন্ত তখন আমার ওপর টীকা-টিপ্পনীর বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। এঁদের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ের সাত চড়ে রা বেরোবে না, কায়াটি তো নয়ই, ছায়াটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না, গলার আওয়াজ টেলিফোন যন্ত্রের মতো হবে, কেবল যাকে বলবে সেই শুনতে পাবে, – বাস্! খুব একটা বুড়োটে ধরনের মিচকেমারা গম্ভীর হয়ে পড়তে হবে, থুবড়ো মেয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাকি কাপাস মহার্ঘ হয়! কোনো অলংকার তো নয়ই, কোনো ভালো জিনিসও ব্যবহার করতে বা ছুঁতেও পাবে না, তাহলে যে বিয়ের সময় একদম 'ছিরি' (শ্রী) উঠবে না। ঘরের নিভৃততম কোণে ন্যাড়া বোঁচা জড়-পুঁটুলি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে চুপসে বসে থাক! – এই রকম সে কত কথা ভাই, ওসব বারো 'ভজকট' আমার ছাই মনেও থাকে না আর শুনতে শুনতে কানও ভোঁতা হয়ে গেছে। 'কান করেচি ঢোল, কত বলবি বোল!' তাছাড়া একথা অন্যকে বলেই বা কী হবে? কেই বা শুনবে আর কারই বা মাথা ব্যথা হয়েচে আমাদের পোড়াকপালিদের কথা শুনতে! খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত-পা যেন পিঠমোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কী! কাজেই, আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ-ঘোষস্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর! সেই মান্ধাতার আমলের পুরোনো মামুলি কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজতক অ-দৃষ্ট! ... আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি! আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মতো কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনও – কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড! ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম! বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ওই দাসীবৃত্তিই করে আসচি, কারণ হজরত আদমের বাম পায়ের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ! আজ সেই কথা টলবে? এসব

কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে। কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষদের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত, আর সেসব কেতাব ও আইন-কানুনের রচয়িতা পুরুষ!...দুনিয়ার কোনো ধর্মই আমাদের মতো নারীজাতিকে এতটা শ্রদ্ধা দেখায়নি, এত উচ্চ আসনও দেয়নি, কিন্তু এদেশের দেখাদেখি আমাদের রীতি-নীতিও ভয়ানক সংকীর্ণতা আর গোঁড়ামি ভণ্ডামিতে ভরে উঠেচে। হাতে কলমে না করে শুধু শাস্ত্রের দোহাই পাড়লেই কি সব হয়ে গেল?

আর শুধু পুরুষদেরই বা বলি কেন, আমাদের মেয়েজাতটাও নেহাত ছোটো হয়ে গেছে, এদের মন আবার আরও হাজার কেসেমের বেখাপ্পা বেয়াড়া আচার-বিচারে ভরা, যার কোনো মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই! এই ধর না এই বাড়িরই কথা। ভয়ানক অন্যায় আর অত্যাচার যেটা, চির-অভ্যাস মতো সেটার বিরুদ্ধে একটু উচ্চবাচ্য করতে গেলেই অমনি গুষ্টিসুদ্ধ মেয়ে দঙ্গল আমার ওপর 'মারমূর্তি' হয়ে উঠবে আর গলা ফেড়ে চেঁচিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলবে, – "মাগো মা, মেয়ে নয় যেন সিংগিচড়া ধিঙ্গি! এ যে জাঁদরেল জাহাঁবাজ মরদের কাঁধে চড়ে যায় মা! আমরা তো দেখে আসচি, সাত চড়ে থুবড়ো মেয়ের রা বেরোয় না, আর আজকালকার এই কলিকালের কচি ছুঁড়িগুলো – যাদের মুখ টিপলে এখনও দুধ বেরোয়, তাদের কিনা সবতাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা! মুখ ধরে পুঁয়ে মাছের মতো রগড়ে দিতে হয়, তবে না থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যায়! আমাদেরও বয়েস ছিল গো, আজ নয়তো বুড়ি হয়েছি, কই বলুক তো, কে বাপের বেটি আছে, – ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে! তাতে আর কাজ নেই! একটু জোরে কাশলেও যেন শরমে শরমে মরে যেতাম, আর এখনকার 'খলিফা' মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপরদালালি, – যেন, অজবুড়ি! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! "...সময় কাটিবে বলে ভাবিজির কাছ হতে দু-চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেচি, এই না দেখে এরা তো আর বাঁচে না! গালে হাত দিয়ে কতরকমেরই না অঙ্গভঙ্গি করে জানায় যে, রোজকেয়ামত এইবারে একদম নিকটে! একটু পড়তে বসলে চারিদিক থেকে ছেলেমেয়ে বুড়িরা সব উঁকি মেরে দেখবে আর ফিসফিস করে কত কী যে বলবে তার ইয়ত্তা নেই। আমি নাকি আমার বিদ্যে জাহির করতে তাদের দেখিয়ে বই পড়ি, তাই তারা রটনা করেচে যে, আমি দু-দিন বাদে মাথায় পাগড়ি বেঁধে

কাছা মেরে জজ ম্যাজিস্টর হয়ে য়্যা চেয়ারে বসব গিয়ে! আমি তো এদের বলবার ধরন দেখে আর হেসে বাঁচিনে! মেয়েদের চিঠি লেখা শুনলে তো এরা যেন আকাশ থেকে পড়ে! মাত্র নাকি এই কলিকাল, এরা বেঁচে থাকলে কালে আরও কত কী তাজ্জব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখবেন! তবে এঁরা যে আর বেশিদিন বাঁচবেন না, এই একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা! আমাদের এই ধিঙ্গি মেমগুলোই নাকি এদের জাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে; এইসব ভেবে ভেবে ওদের রাত্তির বেলায় ভালো করে নিদ হয় না, আর তারই জন্যে তাদের অনেকেরই চোখে 'গোগাল' পড়ে গেছে!...এই রকম সব অফুরন্ত মজার কথা – যেসব লিখতে গেলে আর একটা 'গাজি মিয়াঁর বস্তানি' না মধু মিয়াঁর দফতর হয়ে যাবে! তবু এতগুলো কথা তোকে জানিয়ে আমি আমার মনটা অনেক হালকা করে নিলাম। আমার শুধু ইচ্ছে করচে, তোর সঙ্গে বসে তিনদিন ধরে এদের আরো কত কী মজার গল্প নিয়ে আলোচনা করি, তবে আমার সাধ মেটে! তাই যা মনে আসচে, যতক্ষণ পারি লিখে যাই তো! কেননা, জানি না আবার কখন কতদিন পরে এঁদের চক্ষু এড়িয়ে তোকে চিঠি লিখতে পারব। এখনও মনের মাঝে আমার লাখো কথা জমে রইল। ডাকে চিঠি দিলাম না, তাহলে তো লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত! তাই এই পত্রবাহিকা এলোকেশী বাগদির মারফতেই খুব চুপি চুপি চিঠিটা পাঠালাম। আমাদের গাঁয়ের ও পাড়ার মালকা বিবিকে মনে আছে তোর? ইনি সেই 'পাড়া-কুঁদুলি মালকা' যিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মেয়েদের সাথে ছেলেবেলায় কোঁদল করে বেড়াতেন। আমার এক মামাতো ভাইয়ের সাথে এঁর বিয়ে হয়েচে, তুই তো সব জানিস। এঁর ভাইয়ের নাকি বড্ড ব্যামো, তাই এলোকেশী ঝিকে খবর নিতে পাঠাচ্ছেন। তাঁকে বলেই এই চিঠিটা এমন লুকিয়ে পাঠাতে পারলাম! মালকা প্রায়ই আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে, আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বেচারি এখন বড্ড শায়েস্তা হয়ে গেচে। তার মস্ত বড়ো সংসারের মস্ত ভার ওই বেচারির একা ঘাড়ে। ...চিঠিটা যত বড়োই হোক না কেন, আমি আজ আমার জমানো সব কথা জানিয়ে তবে ছাড়ব। দশ ফর্দ চিঠি দেখে হাসিসনে, বা ফেলে দিসনে যেন। এই চিঠি লিখতে বসে আর লিখে কী যে আরাম পাচ্ছি, সে আর কী বলব! আমার মনের চক্ষে এখন তোর মূর্তিটি ঠিক ঠিক ভেসে উঠচে।

সত্যি বলতে কী ভাই, – রাত্তির-দিন এই দাঁত-খিঁচুনি আর চিবিয়ে চিবিয়ে গঞ্জনা দেখে শুনে এই সোজা লোকগুলোর ওপর বিরক্তি আসে বটে, তবে ঘেন্না ধরেনি। এদের দেখে মানুষের দয়া হওয়াই উচিত! এর জন্য দায়ী কে? – পুরুষরাই তো আমাদের মধ্যে এইসব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েচেন। এমন কেউ কি নেই আমাদের ভেতর যিনি এইসব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা অসূর্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর-দায়ে ধরা পড়িনি। অন্তত পর্দার ভিতরেও একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাইনি। আমাদেরও শরীর-রক্ত-মাংসে গড়া; আমাদের অনুভবশক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হয়ে যায়নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্চেন, কিন্তু আমি একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়েই যাচ্চে। তাঁরা মহিষের মতো গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোনো কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীন ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তাঁরা প্রচণ্ড হুংকারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন। ওঁদের যে সাত খুন মাফ! হায়! কে বলে দেবে এঁদের যে, আমাদেরও স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার করতে পারি। অবশ্য, অন্যান্য দেশের মেয়ে বা মেমসাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বেড়াতে চাই নে বা হাজার হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে গলাবাজিও করতে রাজি নই, আমরা চাই আমাদের এই তোমাদের গড়া খাঁচার মধ্যেই একটু সোয়াস্তির সঙ্গে বেড়াতে চেড়াতে ; যা নিতান্ত অন্যায়, যা তোমরা শুধু খামখেয়ালির বশবর্তী হয়ে করে থাক সেইগুলো থেকে রেহাই পেতে! এতে তোমাদের দাড়ি হাসবে না বা মান-ইজ্জতও খোওয়া যাবে না, আর সেই সঙ্গে আমরাও একটু মুক্ত নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচব, রাত্তির দিন নানান আগুনে সিদ্ধ আমাদের হাড়ে একটু বাতাস লাগবে! তোমরা যে খাঁচায় পুরেও সন্তুষ্ট নও, তার ওপর আবার পায়ে হাতে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে রেখেচ, টুঁটি টিপে ধরেচ, – থামাও, এ সব জুলুম থামাও! তোমরা একটু উদার হও, একটু মহত্ত্ব দেখাও, – এতদিনকার এইসব একচোখা অত্যাচারের, সংকীর্ণতার

খেসারতে এই এক বিন্দু স্বাধীনতা দাও, – দেখবে আমরাই আবার তোমাদের নতুন শক্তি দেব, নতুন করে গড়ে তুলব। দেশ-কাল-পাত্রভেদে, যেটুকু দরকার, আমরা কেবল তাই-ই চাইছি, তার অধিক আমরা চাইবই বা কেন আর চাইলেই তোমরা দেবে কেন?...যাক বোন, আমাদের এসব কথা নিয়ে, অধিকার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে শেষে কি 'আয়রে বাঘ – না গলায় লাগ'-এর মতো কোনো সমাজপতির এজলাসে পেশ হব গিয়ে, অতএব এইখানেই এসব অবান্তর কথায় ধামাচাপা দিলাম।

আমার এইসব যা-তা বাজে বকুনির মধ্যে বোধ হয় আমার বক্তব্যের মূল সূত্রটা ধরতে পেরেছিস। দিন-রাত্তির মনটা আমার খালি উড়ু উড়ু করচে, অথচ মনের এ ভাব-গতিকের রীতিমতো কারণও খুঁজে পাচ্চিনে। এমন একটা সময় আসে, যখন মনটা ভয়ানক অস্থির হয়ে ওঠে – অথচ কেন যে অমন হয়, কীসের জন্যে তার সে ব্যথিত ছটফটানি, তা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, নিজেই ভালো করে বুঝে উঠা যায় না! সে বেদনার কোথায় যেন তল, কোথায় যেন তার সীমা! অবশ্য রেশ কাঁপচে তার মনে, কিন্তু সে কোন্ চিরব্যথার অচিন-বন পারিয়ে আসচে এ রেশ, আর কোন্ অনন্ত আদিম বিরহীর বীণের বেদনে ঝংকার পেয়ে? হায়, তা কেউ জানে না! অনুভব করবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারবে না!...আমার এরকম মন খারাপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েচে বলবে তুমি, কিন্তু ভাই, আমি যে কোনো লোকের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি যে, সেসব মামুলি ব্যথা-বেদনার জন্যে অন্তরে এমন দরদ আসতেই পারে না। এ যেন কেমন একটা মিশ্র বেদনা গোছের; জানের আনচান ভাব, মরমের নিজস্ব মর্মব্যথা যা মনেরও অনেকটা অগোচর। একটা কথা আমি বলতে পারি; – যিনি যতই মানব চরিত্রের ঘুণ হন, তিনি নিশ্চয়ই নিজের মনকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেন না। স্রষ্টার এইখানেই মস্ত সৃজন-রহস্য ছাপানো রয়েচে। আর এ আমাদের মনের চিরন্তন দুর্বলতা, – একে এড়িয়ে চলা যায় না!...আহ্! আহ্!! দাঁড়া বোন, – আবার আমার বুকে সে-কোন্ আমার চির-পরিচিত সাথির তাড়িয়ে দেওয়া চপল-চরণের ছেঁড়া-স্মৃতি মনের বনে খাপছাড়া মেঘের মতো ভেসে উঠচে! সে কোন্ অজানার কান্না আমার মরমে আর্ত প্রতিধ্বনি তুলচে! দাঁড়া ভাই, একটু পানি খেয়ে ঠান্ডা হয়ে তবে লিখব! কেন হয়

ভাই এমন? কেন বুকভরা অতৃপ্তির বিপুল কান্না আমার মাঝে এমন করে গুমরে ওঠে? কেন? – আঃ, খোদা!

বাহা রে! চিঠিটা শেষ না করেই দেখছি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! ...

হাঁ, – এখন, ভাবিজিকে বলিস, যেন ও মাসের আর এ মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলো এরই হাতে পাঠিয়ে দেন। ভুললে চলবে না। আর, তাঁকে বলবি, যেন আমায় মনে করে চিঠি দেন। সকলকে চিঠি লিখবার সময় কই, আর সুবিধাই বা কোথা। নইলে সকলকে আলাদা আলাদা চিঠি দিতাম। তুই ওঁদের সব কথা বুঝিয়ে বলবি, যেন কেউ অভিমান না করেন। আমি কাউকে ভুলিনি। সবাই যেন আমায় চিঠি দেন কিন্তু – হেঁ! আমার মতন তাঁদের তো এরকম জিন্দান-কুঁয়ায় পড়ে থাকতে হয়নি! কাজেই কারুর আর কোনো ওজর শুনচিনে। ভাবিজি, ভাইজি, মা, সবাই আমায় আর মনে করেন কি? – তারপর, এসব তো হল, এখনও যে আদত মানুষটিই বাকি! আমার পিয়ারের খুকুমণি 'আনারকলি' কেমন আছে? এখানে কোনো ছেলেমেয়ে দেখলেই আমার খুকুরানির কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখও ছলছল করে ওঠে! আমার এই দুর্বলতায় আমার নিজের কত লজ্জা পায়। কারণ তোরা হয়তো মনে করবি এ একটা বাড়াবাড়ি। ওই এক টুকরো ছোট্ট মেয়েটাকে আমি যে কত ভালোবেসেছি, তা তোরা বুঝবি কী ছাই-পাঁশ? কথায় বলে, 'বাঁজায় জানে ছেলের বেদন!' অবিশ্যি আমিও যদিচ এখনও তোদেরই মতো ন্যাড়া বোঁচা, কিন্তু আমার মন তো আর বাঁজা নয়! এরই মধ্যে তোর গোলাবি গাল হয়তো শরমে লাল হয়ে গেছে! কিন্তু রোসো, আরও শোন! মনে কর, আমি যদি বলি যে, আমার নিজের একটা মেয়ে থাকলে আমি ভাবিজির সঙ্গে অদল-বদল করতাম,তাহলে তুই বিশ্বাস করিস? দাঁড়া,এখনই ধেই ধেই করে খেমটাওয়ালিদের মতো নেচে দিসনে যেন রাগের মাথায়; আরও একটু শুনে যা – সত্যি বলতে কি সোফি, আমারও একটি ওইরকম ছোট্ট আনারকলির মা হতে বড্ড সাধ হয়! কথাটি নিশ্চয়ই তোর মতন চুলবুলে 'লাজের মামুদ'-এর কাছে কাঁচা ছুঁড়ির মুখে পাকা বুড়ির কথার মতো বেজায় বেখাপ্পা শুনাল, না? বুঝবি লো, তুইও বুঝবি দু-দিন বাদে আমার এই কথাটি! এখন শরমে তোর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠচে, গোস্বায় তোর

পাতলা রাঙা ঠোঁট ফুলে ফুলে কাঁপচে (আহা, ঠিক আমের কচি কিশলয়ের মতো!) কিন্তু এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম, এ গরিবের কথা বাসি হলে ফলবেই ফলবে! মেয়েদের যে মা হওয়ার কত বেশি শখ আর সাধ, তা মিথ্যা না বললে কেউ অস্বীকার করবে না! কী একটা ভালো বইয়ে পড়েছিলাম যে, আমাদেরই মা আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েচেন! তলিয়ে বুঝে দেখলে কথাটা সুন্দর সত্যি আর স্বাভাবিক বোধ হয়। – হাঁ, কিন্তু দেখিস ভাই লক্ষ্মীটি, তোর পায়ে পড়চি, ভাবিজিকে এসব কথা জানতে দিসনে যেন। শ্রীমতী রাবেয়া যার নাম, তিনি যে এসব কথা শুনলে আমায় সহজে ছেড়ে দেবেন, তা জিবরাইল এসে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। একে তো দুষ্টু বুদ্ধিতে তিনি অজেয়, তার ওপর একাধারে তিনি আমার গুরু বা ওস্তাদ আর ভাবিজি সাহেবা! (সেই সঙ্গে রামের সুগ্রীব সহায়ের মতো তুমিও পিছনে ঠেলা দিতে কি কসুর করবে?) নানাদিক দিয়ে দেখে আমি চাই যে, আমার সবকিছু যেন চিচিং-ফাঁক না হয়ে যায়! কেননা এ হচ্চে স্রেফ তোতে-আমাতে দু-সই-এ গোপন কথা। এখানে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ।

এতটা বেহায়াপনা করে সাত কালের বুড়ি মাগির মতো এত কথা এমন করে খুলে কী করে লিখতে পারলাম দেখে হয়তো তুই 'আই – আই – গালে কালি মা!' ইত্যাদি অবাক-বিস্ময়ের বাণী উচ্চারণ করচিস; কিন্তু লিখতে বসে দেখবি যে, মেয়েতে-মেয়েতে (তার ওপর আবার তারা তোর আমার মতো সই হলে আর দূর দেশে থাকলে তো কথাই নেই!) যত মন খুলে সব কথা অসংকোচে বলতে বা লিখতে পারে, অমনটি কেউ আর পারে না। পুরুষরা মনে করে, তাদের বন্ধুতে-বন্ধুতে বসে যত খোলা কথা হয়, অমন বোধ হয় আমাদের মধ্যে হয় না; কিন্তু তারা যদি একদিন লুকিয়ে মেয়েদের মজলিসে হাজিরা দিতে পারে, তাহলে তারা হয়তো সেইখানেই মেয়েদের পায়ে গড় করে আসবে। ওসব কথা এখন যেতে দে, কিন্তু আমি ভাই সত্যি সত্যি মনের চোখে দেখচি, তুই এতক্ষণ লাফিয়ে-চিল্লিয়ে তোর সেই বাঁধা বুলিটা আওড়াচ্চিস, 'মাহ্‌বুবাকে বই পড়িয়ে পড়িয়ে ভাবিজি একদম লজঝড় করে তুলেচেন!' আর সেই সঙ্গে আমার দুঃখও হচ্চে এই ভেবে যে, তুই এখন আর কাকে আঁচড়াবি কামড়াবি? পোড়াকপাল, বরও জুটল না এখনও যে, বেশ এক হাত হাতাহাতি খামচা-খামচি লড়াইটা দেখেও একটু আমোদ

পাই! আল্লারে আল্লাহ্! আমাদের এই তথাকথিত শরিফের ঘরে শুধু ঝুড়ি-ঝুড়ি থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে! বর যে কোথা থেকে আসবে তার কিন্তু ঠিক-ঠিকানা নেই!...

তারপর, আমি চলে আসবার পর খুকি আমায় খুঁজেছিল কি? আমার কেবলই মনে হচ্চে, যেন খুকি খুব বায়না ধরেচে, মাথা কুটে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদচে, আর তোরা কেউ এই দুলালি আবদেরে প্রাণীটির জিদ থামাতে পারচিসনে। আমায় দেখলেই কিন্তু কান্নার মুখে পূর্ণ এক ঝলক হাসি ফুটে উঠত এই মেয়ের মুখে, ঠিক ছিন্ন মেঘের ফাঁকে রোদ্দুরের মতো! কেন অমন হত জানিস? আমি মানুষ বশ করার ওষুধ জানি লো, ওষুধ জানি। বশ করতে জানলে অবাধ্য জানোয়ারকে বশ করাই সবচেয়ে সহজ!

আরও কত কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু লিখে শেষ করতে পারচিনে। তাছাড়া, একটা কথা লিখবার সময় আর একটা কথার খেই হারিয়ে ফেলচি। মনের স্থৈর্যের দরকার এখানে। কিন্তু হায়, মন যে আমার ছটফটিয়ে মরচে! ঘুমুই গিয়ে এখন, ভোর হয়ে এল। কেউ কোথাও জাগেনি, কিন্তু একটা পাপিয়া 'চোখ গেল, উহু চোখ গেল', করে চেঁচিয়ে মরচে। কে তার এই কান্না শুনচে তার সে খবরও রাখে না।

খুব বড়ো চিঠি দিস যদি, তাহলে আমার মাথা খাস! বুঝলি?

তোর 'কলমিলতা' -
মাহ্বুবা
পুনশ্চ –

নুরুল হুদা ভাইজির কোনো খবর পেয়েছিস কী? তিনি চিঠিতে কী সব কথা লেখেন? – মাহ্বুবা।

–––––

সালার

সূচিপত্র

১৩ইফাল্গুন
সই মাহ্‌বুবা!

এলোকেশী দূতীর মারফত তোর চিঠিটা পেয়ে যেন আমার মস্ত একটা বুকের বোঝা নেমে গেল। বাস্‌রে বাস্‌! এত বড়ো দস্যি মেয়ে তুই! কী করে এতদিন চুপ করে ছিলি? জানটা যেন আমার রাত-দিন আই-ঢাই করত। এখন আমার মনে হচ্চে যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলাম। যেদিন চিঠিটা পাই, সেদিনকার রগড়টা শোন আগে। তারপর সব কথা বলচি! – পরশু বিকেলে তোর ওই বিন্দে দূতী মহাশয়া যখন আমাদের বাড়ির দোরে শুভ পদার্পণ করচেন, তখন দেখি, এক পাল দুষ্টু ছেলে তার পিছু নিয়েচে আর সুর-বেসুরের আওয়াজে চিৎকার করচে, ‘আকাশে সরষে ফোটে, গোদা ঠ্যাং লাফিয়ে ওঠে!’ আর বাস্তবিকই তাই – ছেলেদেরই বা দোষ কী! বুড়ির পায়ে যে সাংঘাতিক রকমের দুটি গোদ, তা দেখে আমারই আর হাসি থামে না। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যে, আল্‌বোর্জ-পাহাড়-ধ্বংসী রুস্তমের গোর্জের মতো এই মস্ত ঠ্যাং দুটো বয়ে এই মান্ধাতার আমলের পুরানো বুড়ি এত দূর এল কী করে! ভাগ্যিস বোন, ভাইজি তখন দলিজে বসে এসরাজটা নিয়ে ক্যাঁ কোঁ করছিলেন, নইলে এসব পাখোয়াজ ছেলেরা বুড়িকে নিশ্চয়ই সেদিন ‘কীচকবধ’ করে দিত। মাগি রাস্তা চলে যত না হয়রান হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পেরেশান হয়েছিল ওই ছ্যাঁচড় ছেলে-মেয়ের দঙ্গলকে সপ্তস্বরে পূর্ণ বিক্রমে গালাগালি করাতে আর ধূলা-বালি ছুঁড়ে তাদের জব্দ করবার বৃথা চেষ্টায়। ঘরে এসে যখন সে বেচারি ঢুকল, তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠচে, ভিজে ঢাকের মতো গলা বসে গেছে! ভাবিজি তাড়াতাড়ি তাকে শরবত করে দেন, মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে তেল দিয়ে পাখা করে দেন, তবে তখন বেচারির ধড়ে জান আসে! ওর সে সময়কার অবস্থা দেখে আমার এত মায়া হতে লাগল! কিন্তু কী করি, আমি তো আর বেরোতে পারিনে ভাই, কেউ আর আমায় অচেনা লোকের কাছে বের হতে দেয় না। ভাইজান বলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথা কেউ মানে না। ও নিয়ে আমি কত কেঁদেছি, ঝগড়া করেছি ওঁদের কাছে। লোকে আমায় দেখলে বোধ হয় আমার ‘উচকপালি’ ‘চিরুনদাঁতি’র কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে! না? যাক, – আমি প্রথমে তো তাকে দেখে জানতে পারিনি যে, সে তোদের শাহপুর থেকে আসচে।

পরে ভাবিজির কাছে শুনলাম যে, সে তোদের ওখান থেকে জবরদস্ত একখানা চিঠি নিয়ে এসেচে। ভাবিজি প্রথমে তো কিছুতেই চিঠি দিতে চান না, অনেক কাড়াকাড়ি করে না পেরে শেষে যখন জানলাটায় খুব জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগলাম আর ভাইজান এসে ওঁকে খুব এক চোট বকুনি দিয়ে গেলেন, তখন উনি রেগে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে। আমার তখন খুশি দেখে কে! রাগলেনই বা, ওঃ উনি রাগলে আমার বয়েই গেল আর কী! তাই বলে আমার চিঠি ওইসব বেহায়া ধাড়িকে পড়তে দিই, – আবদার! এইসব কলহ-কেজিয়া করতেই সাঁঝ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দোর বন্ধ করে তোর চিঠিটা পড়তে লাগলাম। প্রথম খানিকটা পড়ে আর পড়তে পারলাম না। আমারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসছিল। আচ্ছা ভাই 'কলমিলতা'! তুই মনে ভাবচিস হয়তো যে, আমি এখানে খুবই সুখে আছি। তা নয় সই, তা নয়। তোকে ছেড়ে আমার দিনগুলো যে কীরকম করে কাটচে, তা যদি তুই জানতিস, তাহলে এত দুঃখেও তোর আমার জন্যে কষ্ট হত। আমি যে তোদের ওই শূন্যপুরী ঘরটার দিকে তাকালেই কেঁদে ফেলি বোন! আমাদের ঘরের সব কিছুতেই যে তোর ছোঁয়া এখনও লেগে রয়েছে। তাই মনে হয়, এখানের সকল জিনিসই তোকে হারিয়ে একটা মস্ত শূন্যতা বুকে নিয়ে হা-হা করে কাঁদচে। সেই সঙ্গে আমারও যে বুক ফেটে যাওয়ার জো হয়েছে! – পোড়া কপাল তোর! মামার বাড়িতেও এই হেনস্থা, অবহেলা! যখন যার কপাল পোড়ে, তখন এমনই হয়। তোর পোড়ারমুখি আবাগি মামানিদের কথা শুনে রাগে আমার গা গিসগিস করচে! ইচ্ছে হয়, এই জাতের হিংসুটে মেয়েগুলোর চুল ধরে খুব কষে শ-খানিক দুমাদ্দম কিল বসিয়ে দিই পিঠে, তবে মনের ঝাল মেটে! জানি, ও দেশের মেয়েরা ওইরকম কোঁদুলে হয়। দেখেছিস তো, ও পাড়ার শেখদের বউ দুটো? বাপরে বাপ, ওরা যেন চিলের সঙ্গে উড়ে ঝগড়া করে! মেয়ে তো নয়, যেন কাহারবা! তোদের কথা শুনে মা, ভাবিজি, ভাইজান কত আপশোশ করতে লাগলেন। তোদের উঠে যাওয়ার সময় মা এত করে বুঝালেন তোর মাকে, তা খালাজি কিছুতেই বুঝলেন না। কেন বোন, এও তো তাঁরই বাড়ি! মা-জান সেদিন তোদের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন, আর কত আর্‌মান করতে লাগলেন যে, আমি তো তাদের নিজের করতে চাইলাম, আর জানতামও চিরদিন নিজের বলেই, তা তারা আমাদের এ দাবির তো খাতির রাখলে না। মাহ্‌বুবাকে তো নিজের

বেটিই মনে করতাম, তা ওর মা ওকেও আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! কী করি, জোর তো নেই!...এই রকম আরও কত আক্ষেপের কথা! এখানে ফিরে আসবার জন্যে মাও ফের চিঠি দেবেন খালাজিকে, আজ ওই নিয়ে ভাইজানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তোর পায়ে পড়ি ভাই, তুই যেন কোনো ল্যাঠা লাগাসনে আর ওরই সাথে। বরং খালাজিকে বুঝিয়ে বলিস, যাতে তিনি থির হয়ে সব কথা ভালো করে বুঝে দেখেন। সত্যি করে বলচি ভাই, তোকে ছেড়ে থাকলে আমি একদম মরে যাব। এই কদিনেই আমার চেহারা কীরকম শুকিয়ে গেচে, তা যদি আসিস, তখন নিজে দেখবি। ভাইজান বলছিলেন, তিনি নিজেই যাবেন পালকি নিয়ে তোদের আনতে। তাই আমার কাল থেকে এত আনন্দ হচ্চে, সে আর কী বলব! এখন, এ-কদিন ধরে যে তোর জন্যে খুবই কান্নাকাটি করেছিলাম, তা মনে হয়ে আমার বড্ড লজ্জা পাচ্চে। সত্যি সত্যিই, ভাবিজি যে বলেন, আমার মতো ধাড়ি মেয়ের এত ছেলেমানুষি আর কাঁদাকাটা বেজায় বাড়াবাড়ি, তাতে কোনোও ভুল নেই। এখন তুই ফিরে আয় তো, তারপর দেখব। তোর ওই এক পিঠ চুলগুলো ধরে এবার আর রোজ রোজ বেঁধে দিচ্ছিনে, মনে থাকে যেন। থাকবি রাত্তির দিন ওই সেই বই-এ পড়া কপালকুণ্ডলার মতো এলো চুলে। তুই যাওয়ার পর থেকে গল্প করতে না পেয়ে জানটা যেন হাঁপিয়ে উঠচে আমার। মর পোড়াকপালিরা, কেউ যদি গল্প করতে চায়! সারাক্ষণই ছাই-পাঁশ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাগো মা ! এই রকম গুম হয়ে বসে থাকলে তো আমার মতন লোকের আর বাঁচাই হয় না দুনিয়ার। মা তো আর ওসব ছেলেমানুষি ভালোবাসেন না! ভাবিজিও যত সব ছাই-ভস্ম রাজ্যের বই আর মাসিক পত্রিকার গাদায় ডুবে থাকেন। নিজে তো মরেছেন, আবার আমাকেও ওইরকম হতে বলেন। কথা শুনে আমার গা পিতপিতিয়ে ওঠে! পড়বি বাপু তো এক আধ সময় পড়, দিনের একটু আধটু কাজের ফাঁকে, তা না হয়ে রাত্তির জেগে বই পড়া! অমন বই-পড়ার মুখে নুড়োর আগুন জ্বালিয়ে দিই আমি। আমার তো ভাই দুটো গল্প পড়বার পরই যেন ছটফটানি আসে, মাথা ধরবার জোগাড় হয়। তার চেয়ে বসে বসে দু-ঘন্টা গল্প করব যে কাজে আসবে! এই কথাটি বললেই আমাদের মুরুব্বি ভাবিটি হেসেই উড়িয়ে দেন। তারপর, বুঝেছিস রে, আমাদের এই ভাবিজি আবার কবিতা গল্প লিখতে শুরু করে দিয়েচেন রাত্রি জেগে। আমি সেদিন হঠাৎ তাঁর একটা ওইরকম খাতা আবিষ্কার

করেছি। ওসব ছাই-ভস্ম কিছুই বুঝতে পারা যায় না, শুধু হেঁয়ালি। তবে, আমাদের খুকিকে নিয়ে যেসব কবিতাগুলো লেখা, সেগুলো আমার খুব ভালো লেগেচে। এখন দেখছি, এই লোকটিকে রীতিমতো আদব করে চলতে হবে।

তারপর 'আনারকলি'র কথা বলি শোন! আমার এই ক্ষুদে ভাইঝিটিই হয়েছে আমার একমাত্র সাথি। তাছাড়া বাড়ির আর কারুর সঙ্গে বনে না আমার। গল্প করায় কিন্তু খুকি আমাকেও হার মানিয়েছে। এই কচি খুকিটি যেন একটা চঞ্চল ঝরনা। অনবরত ঝরঝর ঝরঝর বকেই চলেচে। আর, সে বকার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। এখন দায়ে পড়ে, ওর ওইসব হিজিবিজি কথাবার্তাই আমাকে অবলম্বন করতে হয়েচে আর ক্রমে ভালোও লাগচে। তুই চলে যাওয়ার পর সে 'ফুপুদি দাবো, ফুপুদি দাবো' বলে দিনকতক যেন মাথা খুঁড়ে মরেছিল, এখনও সময় সময় জিদ ধরে বসে। যখন 'না, – ফুপুদি দাবো' বলে এ খামখেয়ালি মেয়ে জিদ ধরে, তখন কার সাধ্যি যে থামায়। যত চুপ করতে বলব, তত সে চেঁচিয়ে-চিল্লিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো-কাদা মেখে একাকার করবে। বাড়িসুদ্ধ লোক মিলে তাকে থামাতে পারে না। কোনোদিন গল্প করতে করতে বা আবোল-তাবোল বকতে বকতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড়টি কাত করে বলে, 'লাল ফুপু নেই – মলে দেছে!' সঙ্গে সঙ্গে মুখটি তার এতটুকু, চুন হয়ে যায় আর একটি ছোট্ট নিশ্বাসও পড়ে, আমার জানটা তখন সাত পাক মোচড় দিয়ে ওঠে বোন! ভাবিজির চোখ দিয়ে তো টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি তাকে সেদিন যখন জানিয়ে দিলাম যে, তাঁর লাল ফুফু সাহেবা মামুবাড়ি সফর করতে গেছেন, তখন থেকে লাল ফুফুর আল্লাদি দরদি এই ভাইঝিটি হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে আর বলে, – 'তাই তাই তাই, মামা-বালি দাই, মামিমাজি ভাত দিলে না দোরে হেদে পালাই!' তোর চিঠিতে এই যে পেনসিলের দাগগুলো দেখচিস, এগুলো এই দুষ্টু মেয়েরই কাটা। আমি যখন চিঠি লিখতে বসি, তখন সে আমার ঘাড়ে চড়ে পিঠে কিল মেরে জোর আপত্তি করতে শুরু করে দিল, সে কিছুতেই আমায় চিঠি লিখতে দেবে না, এখন তাকে ছবি দেখাও। তারপর যেই বলা যে, এ চিঠি তাঁরই প্রিয় মাননীয়া লাল ফুফু সাহেবার, তখন সে ঝোঁক নিলে, 'আমি তিথি লিথ্‌বো ফুপুদিকে!' ভালো জ্বালা বুন, সে কী আর থামে! কী করি, নাচার হয়ে একটা ভোঁতা পেনসিল তার হাতে

দিয়ে দুলালির মান রক্ষে করা গেল, না দিলে সে চিঠিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিত, যা মেয়ের রাগ! এই মেয়েটা কী পাকাবুড়ি বুন, তোর চিঠিটা হাতে করে সে মুখকে মালসার মতো গম্ভীর করে আধঘন্টাখানিক ধরে যা তা বকতে লাগল আর পেনসিলটা যেখানে সেখানে বুলিয়ে প্রমাণ করতে লাগল যে, সেও লেখা জানে! আমার তো আর হাসি থামে না। হাসলে আবার তিনি অপমান মনে করেন কিনা, কারণ তাঁর আত্মসম্মানবোধ এই বয়সেই ভয়ানক রকম চাগিয়ে উঠেচে, তাই তাঁর কাণ্ড দেখে হাসলে তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁদে কেটে খামচিয়ে কামড়িয়ে একেবারে তস-নস করে ফেলবেন! এই চিঠি লেখবার সময়ও ঠিক ওইরকম জোগাড় হয়েচিল, হয়তো আজকে আর এটা লেখাই হত না – ভাগ্যি সেই সময় আমাদের সেই বেঁড়ে বেড়ালিটা তার নাদুস-নুদুস বাচ্চা চারটে নিয়ে সপরিবারে আমার কামরায় দুর্গতিনাশিনীর মতো এসে হাজির হল, তাই রক্ষে। নইলে হয়েছিল আর কী! বেড়াল-ছানাগুলো দেখে খুকি একেবারে আত্মহারা হয়ে সব ছেড়ে তার পেছন পেছন দে ছুট। শ্রীমতী বিড়াল-গিন্নি সে সময়ের মতো সে স্থান থেকে অন্তর্ধান হওয়াই সমীচীন বোধ করলেন। খুকি বেড়াল বাচ্চাগুলোর কানে ধরে ধরে বুঝাতে চেষ্টা করে যে সে ওই বাচ্চা চতুষ্টয়ের মাসি-মা বা খালাজি। অবশ্য, বাচ্চাগুলো বা তাদের মা প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে কিছু মত প্রকাশ করতে সাহস করেনি! উলটে, খুকি যখন তাদের কান ধরে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'পুছু, আমি – আমি তোল কালাজি! না? বেচারি বেড়াল বাচ্চা তখন করুণ সুরে বলে ওঠে, 'মিউ!' অর্থাৎ না স্বীকার করে করি কী? এই গরিব বাচ্চাগুলির ওপর খুকির আমাদের যে মাসির মতোই নাড়ির টান টনটনে সে বিষয়ে আমার আর এই গরিব বেচারিদেরও ঘোর সন্দেহ আছে। মার্জার-পত্নী মহাশয়া তো সেটা স্বীকার করতে একদম নারাজ, – তবু সন্তান-বাৎসল্য অপেক্ষা যে লাঠির বাড়ির গুরুত্ব অনেক বেশি, তা বিড়ালির বিলক্ষণ জানা আছে, তাই তার বুবু সাহেবা অর্থাৎ কিনা আমাদের খুকুমণি সেখানে এলেই সে ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক – সে স্থান সত্বরই ত্যাগ করে! খুকুও তখন বাচ্চাগুলোকে টেনে হিঁচড়ে চাপড়িয়ে লেজ দুমড়ে, কান টেনে যেরকম নব নব আদর-আপ্যায়ন দেখায়, তা দেখে 'মা মরে মাসি ঝুরে' কথাটা একদম ভুয়ো বলে মনে হয়।... আমি বুন কিন্তু এসব দেখতে পারিনে। এইসব অনাছিষ্টি, বেড়ালছানা নিয়ে রাত্তির-দিন ঘাঁটাঘাঁটি, হতভাগা ছেলেপিলের

যেন একটা উৎকট ব্যামো। এই বেড়ালছানাগুলোর গায়ে এত পোকা যে ছুঁতেই ঘেন্না করে, তাকে নিয়ে এই দুলালি মেয়ে সারাক্ষণই ঘাঁটবে নয়তো কোলে করে এনে বিছানায় তুলবে। সেদিন দেখি, – ছি, গাটা ঝাঁকরে উঠচে! – ওর গা বেয়ে বেয়ে ঝাঁকড়া চুলের ভিতর ঢুকচে কত বেড়াল-পোকা! ওর মা তো রাগের চোটে ওকে ধুমসিয়ে একাকার করে ফেললে! আমি শেষে সে কত কষ্টে গা ধুইয়ে চুল আঁচড়িয়ে পোকাগুলো বের করে দিলাম। আর এই হারামজাদা বেড়ালছানাগুলোও তেমনি, খুকিকে দেখলেই ওদের ঝুনঝির নাড়িতে টনক দিয়ে ওঠে, আর তাই লেজুড় খাড়া করে সকুরণ মিউ মিউ সুরে ওদের এই মানুষ খালাটির কাছে গিয়ে হাজির হবে। রাগে আর ঘেন্নায় আমার গা হেলফেলিয়ে ওঠে এইসব জুলুম দেখে! অন্য কেউ এসে এই বাচ্চাগুলোকে ছুঁতে গেলেই তখন গায়ের 'রোঁয়া খাড়া করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, সামনের একটি পা চাটুর মতো করে তুলে এমন একটা ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ করতে থাকে যে, আমি তো হেসে লুটিয়ে পড়ি। বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেই তো একে হাসি পায়, তার ওপর এক মুঠো প্রাণীর এই এতবড়ো কেরদারি দেখে আরও হাসতে ইচ্ছা করে। দাঁড়া, আর দু-দিন দেখি, তারপর ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব এসব আপদগুলোকে! … তোর শেখানো মতো খুকি এখন তার নাম বলতে শিখেচে, 'আনান্‌কলি' !

ভাবিজিও তোকে চিঠি দিলেন। দেখচি, এই দু-দিন ধরে তিনি আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে লিখচেন। আমি তাঁকে তোর চিঠিটা দেখতে দিইনি কিনা এই হয়েচে তাঁর রাগ। কিছুতেই আমাকে তাঁর চিঠিটা দেখালেন না। না-ই দেখালেন, – আমার বয়েই গেল! আমার সঙ্গে ভাবিজির আড়ি! দেখি এইবার কে সেধে ভাব করতে আসে! আচ্ছা মাহ্‌বুবা, তুই আমায় ওঁর সব কথা লুকিয়ে জানিয়ে দিতে পারিস? তাহলে ওঁর সব গুমোর ফাঁক করে দিই আমি।

মাল্‌কার কথা লিখেছিস। ওকে আবার চিনতে পারব না। ক-বছরই বা আর সে আসেনি, এই বোধ হয় বছর পাঁচেক হল, না? আচ্ছা, মেয়েদের ওপর একী জুলুম? পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে বাপের বাড়ি আসতে দেবে না, সামান্য একটু ঝগড়ার ছুতো নিয়ে। … যদি পারিস, তবে মাল্‌কাকে বলে এই মাগিকে দিয়ে আর একখানা চিঠি

পাঠিয়ে দিস। তাহলে খুব ভালো হয়, কেননা ওই সঙ্গে ভাবিজির চিঠিটাও পাব।... আচ্ছা ভাই, এ মাগির নাম এলোকেশী রাখলে কে? এর যে আদতেই চুল নেই, তার আবার এলোকেশ হবে কী করে? যা দু-চারিটা আছে ঝাঁটিগাছের মতো এখনও মাথায় গজিয়ে, তাও আবার এলো জরা নয়, মাথার ওপর একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বড়ির মতো করে বাঁধা। আমার এত হাসি পাচ্ছে! এ যেন যার ঘরে একটা ম্যাচ বাক্স নাই, তার নাম দেদার বাক্স্যা। দিনকানা ছেলের নাম নজর আলি!

তারপর, তোর ভয় নেই লো ভয় নেই! তোর কুলের কথা কাউকে বলে দিইনি। তবে, আমার খুব রাগ হয়েছিল প্রথমে, আর এত লজ্জাও হচ্চে তোর এইসব ছিষ্টিছাড়া কথা শুনে। – ছিঃ মা! তোমার গলায় দড়িও জোটে না? এক ঢাকুন জলে ডুবে মরতে পার না ধিঙ্গি বেহায়া ছুঁড়ি? আমি কাছে থাকলে তোর মুখ ঠেসে ধরতাম। থুবড়ো মেয়ের আবার মা হওয়ার সাধ! তাতে আবার যে সে মেয়ের নয়, ভাই-এর মেয়ের মা! আ-তোর গালে কালি! আয় তুই একবার পোড়ারমুখি হতভাগি, তার মজাটা ভালো করেই টের পাবি আমার কাছে!

পুরুষদের বিরুদ্ধে তোর যে মত, তাতে আমারও মতদ্বৈধ নেই॥ আমিও তোর বক্তিমেয় সায় দিচ্চি। উকিল-'মুখ-তৈয়ার'-এর মতো তুই যেসব যুক্তিতর্ক এনেচিস তাতে আমার হাসিও পায় দুঃখও হয়, আবার রাগও হয়। কারণ, আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, তোর এই মর্দানা হম্বিতম্বিতে কোনো পুরুষপুঙ্গবের কিছুমাত্র আসে যায় না, – এরকম কলিকালের মেয়েদের তারা থোড়াই কেয়ার করে। এর বিহিত ব্যবস্থা করতেও পারেন তাঁরা, তবে কিনা তাঁরা পৌরুষসম্পন্ন পুরুষ, তাই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না। যার গোঁফ আছে, তিনি তাতে চাড়া দিয়ে বলবেন, 'কত কত গেল রতি, ইনি এলেন আবার চকরবতী!' আর, আমিও বলি, দু-দিন পরে যে পুরুষসোপর্দ হবি তা বুঝি মনে নেই! পড়িস, খোদা করে, আচ্ছা এক কড়া হাকিমের হাতে, তাহলে দেখব লো তাঁর এজলাসে তুই কত নথনাড়া আর বক্তিমে দিতে পারিস। তখন উলটো এই অনধিকার চর্চার জন্যে তোর যা কিছু আছে, তার সব না বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, দেখিস!...তোর মোকদ্দমা যে হঠাৎ একতরফা ডিগ্রী হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা বিয়েটা মুলতুবি রয়ে গেল, তজ্জন্য আমি

আন্তরিক দুঃখিত। ওঃ, তোর তরফের উকিল ভাবিজি সাহেবা কি তজ্জন্য কম লজ্জিত আর মর্মাহত? তাই তিনি এখন তাঁর জবর জবর কেতাব ঘেঁটে, মস্ত মস্ত আইন সংগ্রহ করে, অকাট্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগে পুনরায় আপিল রজু করেছেন (তোর বরের নামে!) আসামির নামে জোর তলব ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তবে এখন দিন বাড়বে কিছুদিন, এই যা। তা হোক, মায় খরচা তুই ডিক্রি পাবি, এ আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। তুই ইত্যবসরে একটা ক্ষতি-খেসারতের লিস্টি করে রাখিস, আমি না হয় পেশকার হয়ে সেটা পেশ করে দেব হুজুরে। তাই বলে ঘুষ নেওয়া ছাড়চিনে। কিছু উপুড়হাত না করলে, বুঝেছিস তো একেবারে মুলতুবি! ভালোই হল, এ মোকদ্দমাটা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে একটু বৈচিত্র্য, একটা রগড়ও দেখা গেল! – তুই হয়তো অবাক হচ্চিস, আমি এত কথা শিখলাম কী করে। কী করি, না শিখলে যে নয়; – না-রে কাল সন্ধ্যেবেলায় ভাইজিতে আর ভাবিজিতে এই কথাগুলো হচ্চিল, আমি আড়াল থেকে শুনে সেগুলো খুব মনে করে রেখেছিলাম। এখন তোর চিঠিতে সেই কথাগুলোই মজা দেখতে লাগিয়ে দিলাম। কী মজা! … সে যাক, তুই এখন তৈরি হয়ে থাকিস। বুঝেছিস আমার এই ‘বীণা-পঞ্চমে বোল’? – দাঁড়া তো আসুক সে মজার দিন, তবে না তোর এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার গুড়ে বালি পড়বে? দেখব তখন, খালাজিও তোকে কী করে ধরে রাখেন। তখন হবি আমাদের ঘরের বউ, বুঝেচিস? আমার ওই বদরাগি খালাজিটিকে একবার খুব দু কথা শুনিয়ে দেব তখন। হেঁ, আমি ছাড়বার পাত্তর নই, যতই কেন মুখরা বলুন তিনি। তার পর, তোর গুপ্ত খবর – যা শেষ ছত্রে পুনশ্চে লিখেছিস, তার অনেকটা বোধ হয় আমার লেখায় জানতে পেরেছিস। নূরু ভাইজান নাকি বসরা যাবেন শিগগির, লিখেছেন। বাঙালি পলটন নাকি এইবার যুদ্ধে নামবে। তিনি লিখেচেন, কোনো ভয় নেই, তবু আমাদের প্রাণ মানবে কেন বোন? মা তো কেঁদে সারা। ভাইজান মন-মরা হয়ে পড়েছেন। ভাবিজি তো শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদচেন এ কদিন ধরে। আমার মনও কেমন এক রকম করে এক আধ সময়। তবু আমি বলতে চাই কী, আমার কিন্তু ওতে এতটুকু ভয় হয় না। পুরুষের তো কাজই ওই। আজকালকার পুরুষরা যা হয়েছেন তাতে ওদের জাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। ওদের হুবহু মেয়ে হওয়ার সাধ, – সাজ-সজ্জা ধরন-ধারণ সবেতেই! কাজেই শরীরটা হচ্চে আমাদেরই মতো ননীর ঢেলা, যাকে শুধু বিলাস-ব্যসনেই লাগানো

যেতে পারে, কোনো শক্ত কাজে নয়; আর বাক্যবাগীশ এত হয়ে পড়েচেন যে, মেয়ের জাত মুখ গুটোতে বাধ্য হয়েছে। ছিঃ, বোন, এই কি পুরুষের কাজ? যে পুরুষের পৌরুষ নেই, তারা সত্যি সত্যিই গোঁফ কামিয়ে দেয় দেখে আর দুঃখ হয় না। আমাদের বাড়ির দারোয়ানটাকে গোঁফ কামানোর কথা বললে সে রাগে একেবারে দশ হাত লাফিয়ে ওঠে, কেননা ওদের আর কিছু নাই থাক, গায়ে পুরুষের শক্তি আছে; উলটো আমাদের দেশে গোঁফ রাখতে বললেই অনেকে ওইরকম লাফিয়ে উঠবেন, কেননা তাঁদের গায়ে মেয়েদের ঝাল আছে! এঁরাই আবার বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে মেয়েদের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে যাত্রার দলের ভীমের চেয়েও জোরে লাফ-ঝাঁপ জুড়ে দেন! একেই বলে, 'নির্গুণো সাপের কুলোপানা ফণা'। আমার কেন মনে হচ্ছে, নূরু ভাইজি আবার বেঁচে ফিরে আসবেন, আর তুই হবি তাঁর – আমার এই পুরুষ ভাই-এর – অঙ্কলক্ষ্মী। তুই হবি এক মহাপ্রাণ বিরাট পুরুষের সহধর্মিণী! আমার মনে এ জোর যে কে দিচ্চে তা বলতে পারিনে, তবে কথা কী, আমার মন তোদের মতো শুধু অলক্ষুণে কথাই ভাবে না। ... এইখানে কিন্তু তোর সঙ্গে একটা মস্ত ঝগড়া আছে। বলি, হ্যাঁ লো মুখপুড়ি বাঁদরি! তোর আর বুদ্ধি হবে কখন? সে কী কবরে গিয়ে? দু-দিন বাদে যে নূরু ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে, কোন্ লজ্জায় তুই তাঁর নাম নিস, আবার ভাইজি বলে লিখিস? ওরে আমার ভাই-এর দরদি বোনরে! দূর আবাগি হতচ্ছাড়ি, তুই একদম বেহায়া বেল্লিক হয়ে পড়েচিস!

আচ্ছা ভাই 'কলমিলতা'! তুই আমার নূরু ভাইজানকে খুব জান থেকে ভালোবাসিস, না? সত্যি করে লিখিস ভাই, – নইলে আমার মাথা খাস! যদি ঝুট বলিস তাহলে তোর সাথে (এই আঙুল ফুটিয়ে বলচি) আড়ি – আড়ি – আড়ি! তিন সত্যি করলাম একেবারে। আর, বাস্তবিক সই, আমার এ ভাইটির কাউকে শত্রু হতে দেখলাম না। কেই বা ওঁকে ভালোবাসে না? – যাকে খোদায় মারে, তাকে বুঝি সবাই এমনই একটা স্নেহের, বেদনাভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে! মনে হয়, আহা রে, হতভাগা, কী করে তুই এত দুঃখ হাসিমুখে বইছিস। অথচ সবচেয়ে মজা এই যে, যার জন্যে আমরা এত বেদনা, ব্যথা অনুভব করি, সে ভুলেও সেকথার উল্লেখ করে না, নিজের ভাবে নিজেই মশগুল। উলটো তার দুঃখে কেউ এই সহানুভূতির

কথা জানাতে গেলে তার সঙ্গে সে মারামারি করে বসে। এ মানুষ বড়ো সাবধান, যেই বুঝতে পারে যে, অন্যে তার বেদনা বুঝতে পেরেছে অমনি সে ছটফটিয়ে ওঠে; তার ওপর তার ওই অত বড়ো দুর্বলতাটা ধরে আহাম্মকের মতো তাতে হাত দিতে গেলে তো আর কথাই নাই, সে একেবারে ক্ষিপ্ত সিংহের মতো তার ওপর লাফিয়ে পড়ে। – আমার তো এই রকমই মনে হয়। নূরু ভাইজিকে যেন আমি অনেকটা এই রকমই বুঝি, অবশ্য এক আধটু গরমিলও দেখা যায়। তুই কী বলিস? …

থাকগে, এসব বারো কথা। শিগগির উত্তর দিস। ইতি –

তোর 'সজনে ফুল'
সোফিয়া

———————-

করাচি সেনানিবাস
১৫ই ফেব্রুয়ারি (দুপুর)
ভাবি সাহেবা!

হাজার হাজার আদাব। আপনার চিঠি পেয়েচি। সব কথা বুঝে উত্তর দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নেই আর সময়ও নেই। পরে যদি সময় পাই আর ইচ্ছা হয়, তবে আপনার সব অনুযোগের একটা মোটামুটি কৈফিয়ত ভেবেচিন্তে দিলেও দিতে পারি। কিন্তু বলে রাখচি আমি, – আর আপনারা আমায় এরকম করে আঘাত করবেন না। মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করাও যে একটা মস্ত বড়ো দুর্বলতা তা আজ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝচি। তা নাহলে আজ আমি এত কষ্ট পেতাম না। আপনাদের এ আঘাত দেওয়ার অধিকার আছে বটে, আমারও সইবার অধিকার আছে, কিন্তু সইবার শক্তি নেই আমার। এটা তো বোঝা উচিত ছিল। আমার এই কথা কটি বুঝতে চেষ্টা করে আমার এই নির্দয় কঠোরতাকে ক্ষমা করবেন।

দেখুন, মানুষের যেখানে ব্যথা, সেইখানটা টিপেও যে আরাম পায়। অন্তরের বেদনাও ঠিক ওই রকমের। তাই, জেনে হোক – না জেনে হোক, কেউ সেই বেদনায় ছোঁয়া দিলে এমন একটা মাদকতা-ভরা আরাম পাওয়া যায়, যেটার পাওয়া হতে হাজার চেষ্টাতেও নিজেকে বঞ্চিত করা যায় না, বা এড়িয়ে চলবারও শক্তি অসাড় হয়ে যায়, এমনই ভয়ানক এর প্রলোভন। তাই আমি মুক্তকণ্ঠে বলচি, আপনাদের দেওয়া এই আমার বেদনার আঘাত মধুর হলেও আমার কাছে অকরুণ – ভীষণ দুর্বিষহ। এ আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এ প্রলোভনের মুখে একটু ঢিলে হয়ে পড়লেই পদ্মার ঢেউ-এ খড়-কুটাটির মতো ভেসে যাব। – সে কী ভয়ানক! আমার অন্তর শিউরে উঠচে! পায়ে পড়ি আপনাদের, আর আমায় এমন করে খেপিয়ে তুলবেন না। আমার বেদনাভরা দুর্বলতার মূল কোথায় জেনে ঠিক সেইখানে কসাইয়ের মতো ছুরি বসাবেন না। রক্ষা করুন – মুক্তি দেন আপনাদের এই স্নেহের অধিকার হতে। আমার প্রকাশ-করা দুর্বলতা আমারই ক্ষুব্ধ বুকে পলটনের জল্লাদের হাতের কাঁটার চাবুকের আঘাতের মতো বাজচে। তাই এ চিঠিটা লিখচি আর রাগে আমার অষ্টাঙ্গ থরথর করে কাঁপচে! আমার মতন বোকাচন্দ্র বোধ হয় আর দুনিয়ায় দুটি নেই!

আমাদের ‘মোবিলিজেশন অর্ডার’ বা যুদ্ধ-সজ্জার হুকুম হয়েচে। তাই চারিদিকে ‘সাজ সাজ’ রব পড়ে গেছে। খুব শীঘ্রই আরব সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরচে না। আমি চাচ্ছিলাম আগুন – শুধু আগুন – সারা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে, বাইরে-ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন্ আগুন কোন্ আগুনকে গ্রাস করে নিতে পারে, আরও চাচ্ছিলাম মানুষের খুন! ইচ্ছা হয়, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে চোঁ চোঁ করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিই, তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে! কেন মানুষের ওপর আমার এত শত্রুতা? কী দুশমনি করেছে তারা আমার? তা আমি বলতে পারব না। তবে, তারা আমার দুশমন নয়, তবুও আমার তাদের রক্তপানে আকুল আকাঙ্ক্ষা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্চে এখানে যে, এই মানুষেরই এতটুকু দুঃখ

দেখে সময় সময় আমার সারা বুক সাহারার মতো হা হা করে আর্তনাদ করে ওঠে! হৃদয়ের এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দুশমনিভাব, এর সূত্র কোথায়, – হায়, কেউ জানে না। অনেক অনধিকারী আমার এ জ্বালা, এ বেদনা বুঝবে না ভাবিসাহেবা, বুঝবে না। বড্ড ব্যস্ত, খালি ছুটোছুটি, – তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি যা পারলাম, লিখে দিলাম। চিঠিটা দু-তিনবার পড়ে আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করবেন।

তারপর আপনি মাহ্‌বুবার কথা লিখেচেন। সে অনেক কথা। এর সব কথা খুলে বলবার এখনও সময় আসেনি। তবে এখন এইটুকু বলে রাখচি আপনায় যে, মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ! আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুশমনি মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর। এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারব না, – পারব না! আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নামে পুড়িয়েও আমায় কবজায় আনবার শক্তি ওই অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্ব গ্রাস করবার মতো ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে। আমি তাঁকে তবে ভয় করব কেন? … আপনি আমায় শয়তান বলবেন, আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙুল দেবেন জানি, – ওহ্, তাই হোক! বিশ্বের সবকিছু মিলে আমায় ‘শয়তান পিশাচ’ বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই। আঃ! … যে মানুষের স্রষ্টাকে ভয় করিনে আমি, সেই মানুষকে ভয় করে আমার অন্তরের সত্যকে গোপন করব কেন? আমি কি এতই ছোটো, এতই নীচ? আমার অন্তর মিথ্যা হতে দেব না!… হাঁ, কী বলছিলাম? আমি বিশ্বাসঘাতক – জল্লাদ! বাঁশির সুরে হরিণীকে ডেকে এনে তার বুকে বিষমাখা তলওয়ার চালিয়ে আর ‘জহর-আলুদা’ তির হেনেই আমার সুখ। সে কী আনন্দ ভাবিসাহেবা, সে কী আনন্দ এই হত্যায়! আমার হাত-পা-বুক বজ্রের মতো শক্ত হয়ে উঠচে!

কী আমায় মাতাল করে তুলচে আর সঙ্গে সঙ্গে যে কোন্ অনন্ত যুগের অফুরন্ত কান্না কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠচে বিষের মতো – তীব্র হলাহলের মতো! – আর লেখার শক্তি নেই আমার! – ইতি।

নরপিশাচ –
নূরুল হুদা

ঙ

বাঁকুড়া
২রা ফেব্রুয়ারি
(নিশুত রাত্তির)
কবি-সৈনিক নূরু!

‘একচোখো; ‘এক-রোখো’ প্রভৃতি তোর দেওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি বিশেষণ আমি আমার আঁতুড়-ঘর থেকে এই বিশ বছরের ‘যৈবন বয়েস’ নাগাদ বরাবর কুইনাইন-মিক্সচারের মতন গলাঃধকরণ করতে প্রাণপণে আপত্তি জানিয়েছি, কারণ সেসময় এসব অপবাদে জোর ‘চটিতং’ হয়ে মনে করতাম তোর স্বভাবই হচ্ছে লোকের সঙ্গে কর্কশ বেয়াদবি করা আর মুখের ওপর নির্মম প্রত্যুত্তর করা। অনেক সময় তোর ওই নির্ভীক সত্য ও স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায় ও আত্মসম্মানের গভীর অনুভূতিকে অহংকার অহমিকা প্রভৃতি বলেও মনে করেছি। বন্ধুমহলেও তোর ওই কথা নিয়ে অনেক সময় কুৎসা হয়েচে। কিন্তু আজ শোওয়ার আগে হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ে গেল পাশের এক বালিকা-কণ্ঠে এই গানটা শুনে –

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।

আরও মনে পড়ল, এই গানটাই তোর মুখে হাজারবার শুনেছি এবং আজও কচি গলার সুরে তা শুনলাম, কিন্তু সেসময় তোর কণ্ঠে যে গভীর বেদনার আভাস ফুটে উঠত, জনম-জনম অতৃপ্ত থাকার ব্যথা-কান্না যে শিহরণ-ভরা মূর্ছনার সৃজন করত, তা এ বালিকার সরল কণ্ঠের সহজ সুরে পাই না। এই কথাটি মনে হতেই তোর সজল কাজল-আঁখির-আকুল-কামনা-ভরা চিঠিটা আর একবার পড়তে বড্ড ইচ্ছে হল। আজ এই নিশীথ রাতে তোর মেঘলা দিনের লেখা চিঠিটা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, চিঠিটা প্রথম দিন পেয়ে কেন এমন অভিভূত হইনি। সেদিন বুঝি চারিদিককার কোলাহলে তোর প্রাণের গভীর কথা আমায় তলিয়ে বুঝতে দেয়নি, শুধু ওতে যে মুক্ত হাসির স্বচ্ছ ধারাটুকু আছে, সেই ধারার কলোচ্ছ্বাসই আমার মন

ভুলিয়েছিল। আজ যেন কোন্ গুণীর পরশে সহসা আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছে আর তোর মর্মের মর্মস্থলেরও নিষ্করুণ চিত্র দেখতে পেয়েছি। তাই আজ বুঝেচি ভাই, এ কী অকরুণ নিরেট হাসি তোর! কান্না সওয়া যায়, কিন্তু বেদনাতুরের মুখে এই যে কুলিশ-কঠোর হিম হাসি, এ যে জমাট শক্ত অশ্রু-তুহিন! এ যে পাথরও সইতে পারে না। যার প্রাণে আছে, বেদনার অনুভূতি আছে, যে এমনি নীরব রাতে একা বসে কোনো স্নেহহারার এমনি নীরস শুষ্ক হাসি শুনেছে, সেই বোঝে এ হাসি কত দুর্বিষহ! তাই আজ তোর চিঠিটা পড়তে পড়তে বুকের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত তোলপাড় করে উঠতে লাগল!

একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালিয়ে এই আঁধার বিভাবরীতে আমার সামনের বাতায়ন দিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখতে চেষ্টা করচি আর ভাবচি – হায় তোর জীবনের রহস্যটা এই অন্ধকার-নিপীড়িত নিশীথের চেয়েও নিবিড় কৃষ্ণ পর্দায় আবৃত! সে বধির-যবনিকা চিরে তোর অন্তরের অনন্ত দিগ্মণ্ডলের সন্ধান নিতে যাচ্ছি আমার এই ঘরের প্রদীপটির মতোই ক্ষীণ কালো শিখা নিয়ে। তাই বুঝি অন্তরঙ্গ সখা হয়েও তোর ওই অথই মনের থই পেলাম না, অসীম হিয়ার সীমারেখা ধরি-ধরি করেও ধরতে পারলাম না। ও মন কেবলই আমাকে আকাশের মতো প্রতারিত করেছে; যখনই মনে করেছি – ওই ওইখানেই গাঙের পারে আকুল আকাশ আর উদাস মাঠে চুমোচুমি হয়েচে, তখনই আমি প্রতারিত হয়েছি। সেই মিলন-সীমায় পদাঙ্ক আঁকতে যতই ছুটে গিয়েচি, ততই সে দিকের শেষ দূরে – আরও দূরে সরে গিয়েছে। কোথায় এ বাঁধন-হারা দিগ্বলয় কার অসীম আকাশের মোহানা, তা কে জানে! আমরা নিয়তই বাঁধন-বাঁধার ডোর সৃজন করে ওই অসীমতাকে ধরবার চেষ্টা করছি, আর দুষ্ট চপল শশক-শিশুর মতো সে ততই এক অজানা বনের গহন-পথের পানে ছুটে চলেছে! সে দুরন্ত-শিশু নেমে আসে কখনও মাঠের ধারে গাঁয়ের পাশে, কখনও গাঙ পারিয়ে আমলকি-ছায়া-শীতল ঝরনা-তীরে, আবার কখনও শাল-পিয়াল আর পলাশবনের আলো-ছায়ায়। একটি পাতাঝরার শব্দ শুনেই সে চমকে উঠে অনেক দূরে গিয়ে তার চটুল চোখের নীল চাউনি ইশারায় ভ্রান্ত পথিককে ডাকতে থাকে। তোর নিরুদ্দিষ্ট উদাসীন মন অমনই সে-কোন্ এক আবছায়া ভরা অচিন অসীমের পানে যে ছুটেচে, তা তুইই জানিস ; তোর এই

কান্ডারিহীন হিয়ার তরি যে কোন্ অকূলের কূল লক্ষ করে এমন খাপছাড়া পথে পাড়ি দিয়েছে, তা কোনো মাঝিই জানে না। আমি ভাবচি, হয়তো এ নিরুদ্দেশ যাত্রীর দুঃসাহসী ডিঙাখানি ওই দুই অসীমের মোহানাতেই গিয়ে জয়ধ্বনি করবে, না হয়, কোথাও ঘূর্ণি- আবর্তে পড়ে হঠাৎ ডুবে যাবে, নয়তো কোন্ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডিঙার বাঁধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে! ভবিষ্যৎটা আমি নির্দয়ভাবেই কল্পনা করলাম, কারণ আমি জানি নির্মম সত্য তোর কাছে কোনোদিন অপ্রিয় লাগেনি, এবারেও আমার এসব বেহুদা কথায় রাগবিনে বা দুঃখ পাবিনে আশা করি।

তোর সজল কাজল-আঁখি প্রেয়সী যে কোন্ কোকাফ মুল্লুকের পরিজাদি, তাই ভেবে আমি আকুল হচ্চি। শ্রীমতী মাহ্‌বুবা খাতুনই সে সৌভাগ্যবতী কিনা, সে সম্বন্ধে এখনও আমি সন্দেহ-দোলায় দুলচি। তাহলে তুই আগে মত দিয়ে পরে বিয়ের কদিন আগে তাকে কেন এমন করে এড়িয়ে ত্যাগ করে গেলি? তোর এ এড়িয়ে-যাওয়ার দু রকম মানে হতে পারে; প্রথম, হয়তো তাকে ভালোবাসিসনি, – দ্বিতীয়, হয়তো তাকে মন দিয়ে ফেলেছিলি বলেই নিজের এই দুর্বলতা ধরা পড়ার ভয়ে এমন করে ভেসে গেলি। কোনটাতো সত্য? আমার বোধ হয়, দ্বিতীয় ঘটনাটাই ঘটা খুব সম্ভব আর স্বাভাবিক। তুই আমার এইসব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ দেখে আমায় ঔপন্যাসিক ঠাউরাসনে যেন। সকলের পক্ষে যেটার অন্তরে উদয় হওয়া স্বাভাবিক, আমি কেবল সেইটাই যতটা প্রকাশ করা যায়, ভাষার বাঁধন দিয়ে আগলাবার চেষ্টা করচি। মাহ্‌বুবার অবস্থা আমি নিজে কিছু না দেখলেও বুবুজান যেরকম করে বলছিলেন, তাতে মর্মর দেউলেরও বুক ফেটে যাওয়ার কথা। অবশ্য তিনি সব কথা খুলে বলতে পারছিলেন না আমার কাছে ; কিন্তু ওই বাধো-বাধোভাবে কথাটা চাপতে গিয়েই সেটার গোপন তত্ত্ব যতটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তাতে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, সে বেচারির নরম বুকে তোর ভালোবাসার 'খেদং তির' বড়ো গভীর করে বিঁধেচে! এ নিদারুণ শায়কের বিষ তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়েচে! বুঝি সে অভাগির আর রক্ষে নেই। বুবুজানও এই ভেবে একরকম অস্থির হয়েই পড়েচেন। তাঁর ভয়ের আদত কারণ বোধ হয়, তিনি মনে করেন যে, মৌন বুকের এই বধির চাপা ভালোবাসার গভীরতা যেমন বেশি, মারাত্মকও তেমনই।

এই গভীর বেদনাই তাকে হত্যা করে ছাড়বে। … এইসব নানান দিক দেখে আমার আর ইচ্ছে হয় না ভাই যে বিয়ে করি। আমার অন্তরঙ্গ সখার বুভুক্ষু আঁখির আগে আমি নিজের ভালোবাসার ক্ষুধা মেটাব, আর সে শুধু গোবিসাহারার তপ্ত বালুকায় দাঁড়িয়ে ছাতি-ফাটা পিয়াস নিয়ে তেষ্টায় বুক ফেটে মরবে, এমন স্বার্থপরের মতো ছোটো কথা ভাবতেও যে আমার জানটা ওলট-পালট করে ওঠে ভাই! তাই আমি আজ গোলাবি শরবতের পেয়ালা ওষ্ঠের কাছে ধরে ভাবছি, – তিয়াসা মিটাই, না এ পেয়ালা চূর্ণ করে তোর মতো অজানার পথে বেরিয়ে পড়ি। তুই এ পথা-হারা অন্ধকে পথ দেখিয়ে দিতে পারিস? ভেসে পড়ি তাহলে আল্লা বলে! কিন্তু বলে রাখি, জটিল জটাজূটধারী লোটা-কম্বল-সম্বল 'কম্‌লি ওয়ালে' সাজতে আমি পারব না। নাগা সন্ন্যাসীর মতো স্বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তিপথ নয়। আমার মতো গো-মুখ্যুর কথা যদি শুনিস তাহলে আমি বলি কী, তোর গুরুদেবের উদাত্ত নির্ভীক বাণীতে তুইও যোগ দিয়ে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল; –

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ!

আছে তোর এ সাহস? বল তাহলে আমিও বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে কাছা এঁটে একবার লেগে পড়ি।…

হাঁ, তারপর – ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতিতে তোর কোন্‌ জাঁদরেল-তন্বীর বা জাহাঁবাজ-কিশোরীর দাপাদাপি মনে পড়েছিল রে? আমি তো ভেবেই পাচ্চিনে। শুনি, কবিকুল নাকি কল্পলোকের জীব ; তারা স্রেফ কল্পনা নিয়েই মশগুল, তাঁদের কথায় বাস্তবতা একরকম 'নদারদ' বললেই হয়। আর, এই যদি হয় কবির সংজ্ঞা, তাহলে তুইও কবি (এবং সেই জন্যেই তোকে প্রথমেই কবিসৈনিক বলে সম্বোধন করেছি)। আচ্ছা, এই যে তোর খেলার সাথি দুষ্ট চপল প্রিয়া. ইনি তোর মানসী-বধূ, না কোনো রক্ত-মাংসের শরীরধারিণী সত্যিকার মানবী? রাজকন্যা, স্বপ্নরানি, পরিস্থানের বাদশাজাদি, ঘুমের দেশের আলোক-কুমারী বা ওই কেসেমেরই যত

সব উদ্ভট সুন্দরীদের রাঙা চরণের আশা যদি থাকে তোর, তবে দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মতন ওসব খামখেয়ালি এক্ষুণি ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! গোলে-বকাওলিতেই লেখা থাক, বা আরব্য উপন্যাসের উজিরজাদিই বলুন, – কিন্তু কই কাউকে তো সত্যি সত্যিই কোনো পাখনাওয়ালি পরি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলে শুনলাম না। পালঙ্কসুদ্ধ উড়িয়ে না নিয়ে যাক রে ভাই, অন্তত বিছানার চাদরটা জড়িয়েও তো আমাকে ওই পরি-বানুরা এক-আধ দিন তাঁদের আজব দেশে নিয়ে যেতে পারতেন। কত দিন শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্তের চাঁদিনি-চর্চিত যামিনীতে ছাদে শুয়ে শুয়ে সর্দি-কাশি ধরিয়েচি, কিন্তু এ পোড়াকপালে ওই গগনমার্গের দিকে চক্ষু তেড়ে তাকানো ছাড়া আর ওড়া হল না। বাদুড় চামচিকে উড়ে যেতে অনেক দেখেচি, কিন্তু কোনো পরির আসমানি চাদর বা হেনায়-রাঙা পদপল্লব বা ডাঁশা আঙুরের মতন ঢলঢলে মুখ দেখা তো দূরের কথা, তাদের পাখা-পাখনারও একটি থর বা কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। ... সেসব যাক, এখন তোর নামে মস্ত একটা অভিযোগ দেব, যে অভিযোগ কখনও দেব বলে আমার আজকের রাতের আগে আর মনে হয়নি। আজ যেন দিনের মতন সাফ বুঝতে পাচ্চি, কখনও তোর মনের কথা পাইনি বা তোকে বুঝতেও পারিনি। শুধু তোর ওই ওপরকার হাসির ছটাতেই ভুলে ছিলাম। আজ যখন তুই অনেক দূরে মরণের বুকে দাঁড়িয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করছিস, যখন মনে পড়ছে যে হয়তো তোর সাথে আমাদের আর দেখা নাও হতে পারে, তখনই বুকের ভেতর এক অশান্ত অসোয়াস্তি তোলপাড় করে উঠচে – হায়, কেন এতদিন তোকে কাছে পেয়েও আরও কাছে পাইনি ; কেন তোকে বুঝতে পারিনি! – কার করুণা-মাখা অধর, কার বিদায়-ক্ষণের চেয়ে থাকা তোকে মেঘলা-দিনে এমন উতলা করে তোলে? সজলমেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়? আমি তাই এ নিশীথ রাতে একলা বসে ভাবচি আর ভাবচি। সে কে? কোন্ কিশোরীর ভালোবাসার হিরা তোর মনের কাচকে দু-ফাঁক করে কেটে দিয়েছে? কোন্ খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরন্তনী হয়ে ফুটেচে? তা তুই আর হয়তো তোর মানসী দেবী ছাড়া কেউ জানে না। তোর জীবনের পথে আচমকা আসা অনেকগুলি কচি-কিশোর মুখ মনের মাঝে ভেসে উঠচে, কিন্তু কোনোটাকেই মনে লাগচে না যে এ তোর মর্মর মর্মে স্থায়ী নিবিড় দাগ কাটতে পারে। এ সবারই মাধুরী শুধু সৌদামিনীর মতো একটুখানিক চমকে

হেসে আঁধার পথের যাত্রীর চোখ ঝলসিয়ে দিয়ে যাচ্চে। একটা কথা কিন্তু এইখানে মনে হচ্চে আমার। – যদি কোনো এক কিশোরী কুমারীর মাঝে থাকত আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত সোফিয়া খাতুনের গভীর অভিমান-ভরা মিষ্টি দুষ্টুমি আর অবাধ্য চপলতা, এবং সেই সাথে শ্রীমতী মাহ্‌বুবা খাতুনের নিবিড় ভালোবাসা-মাখা করুণা ও বিদ্রোহ-মাধুর্যের আমেজ, – আর সেই সুন্দরী যদি নিঃসংকোচে সহজ সরলভাবে তোকে তার পথে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারত, তবে একমাত্র সেই তোর বাঁধন-হারা জীবনটাকে এমন করে মরুর মাঝে শুকিয়ে মরতে না দিয়ে সফলতার পুষ্পমঞ্জরিতে মুঞ্জরিত করে তুলত। – তুই বাইরে যত বড়োই বেহায়া বেল্লিকপনা কর না কেন, অন্তরে তোর মতন লাজুক আর কেউ নেই ; তোর ভিতরের লজ্জাশীলতার কাছে আমাদের নব-বধূদেরও হার মানতে হবে। আমি বরাবর দেখে এসেচি, যেখানে বেশ সোজাভাবে মিশতে না পারার দরুণ তোর গোপন দুর্বলতার শক্ত বাঁধন একটু শিথিল হয়ে এসেচে, সেইখানেই তুই মন্ত্রবশীভূত গোখরো সাপের মতন ফণা গুটিয়ে বসে পড়েছিস। বিশেষত, কোনো অচেনা সুন্দরী তরুণীর মুখোমুখি হলেই তুই দু-একদিন যেরকম ব্যতিব্যস্ত খাপছাড়া ভাব দেখাতিস কথায় কাজে, তার সত্যিকার গূঢ় হেতুটা কী বল দেখি? সেটা সুষমা-পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা, না ওই রূপের ফাঁদে ধরা পড়বার ভীতি-কম্পন? তোর আরও একটা দুর্বলতা ও শক্ত শক্তির কথা মনে পড়চে আমার – তুই যেমন শিগগির কোনো কিছুতে অভিভূত হয়ে পড়তিস, সেই রকম শীঘ্রই আবার সেটার কবল থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারতিস। অবশ্য শেষের গুণটা পৌরুষ না হয়ে নির্মম নির্দয়তারই বেশি পরিচয় দেয়। তোকে যে ধরতে যাবে, তাকে আগে নিজেকে ধরা দিতে হবে। অনবরত স্নেহের সুরধুনী বইয়ে প্রীতির মরূদ্যান রচনা করে, তোর মরুযাত্রী পিয়াসি আত্মাকে যদি কোনো নারী প্রলুব্ধ আকৃষ্ট করতে পারত, তাহলে বোধ হয় এই তরুণ বয়সেই তোর বেদনার বোঝা এত অসহ্য হয়ে উঠত না! তোর মতন বিপুল অভিমানী যে কারুর স্নেহ যাচঞা করে না, তা আমি জানি। আমি আরো জানি, তোদের মতো অভিমানীদের আত্মসম্মান-জ্ঞান আর দুর্বলতা ধরা পড়বার ভয় ভয়ানক তীক্ষ্ম সজাগ। কিন্তু এ আমি বলবই যে, এটা তোদের অনেকটা যেন একগুঁয়েমি ; তোদের মনের অতৃপ্ত কামনা একটা তরুণ বুকের স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার আশায়, দুটি টানা চোখের

মদিরাভরা শিথিল চাউনির আবেশের ক্ষুধায়, একটি কম্পিত পাতলা ঠোঁটের উষ্ণ পরশের তৃষায় হা হা করে ছাতি ফেটে মরচে – বোশেখ-মধ্যাহ্নের আতপ তপ্ত ভুখারি ভিক্ষুকের মতো! কিন্তু এত আকণ্ঠ পিপাসা নিয়েই সে তৃষাতুর কামনা শুধু তীব্র অভিমানের রোষে আত্মহত্যা করচে! নরঘাতকের মতো তোরা বাসনার গর্দানে খড়্গের ওপর খড়্গা হেনে তাকে কাটতে তো পারছিসইনে, শুধু কচলিয়ে কচলিয়ে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা দিচ্চিস! তবু পাষাণ – তোদের বিক্ষুব্ধ ক্ষোভ মিটল না, মিটল না! এর ফল বড্ড ভয়ানক, অতি নিষ্করুণ! তাই বলি ভাই নূরু, তোর পায়ে পড়ে বলি, ফিরিয়ে আন তোর এ গোঁয়ার মনকে এই গোবির তপ্ত উষার ধুধু শুষ্কতা হতে! এতে অন্ধ হবি, শক্তি হারাবি, অথচ কিছুই হবে না জীবনের। তোর মধ্যে যে বিরাট শক্তি সিংহ সুপ্ত রয়েচে, কেন তাকে এমন করে এক অজানার ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা করবি? সংসারে থেকে সংসারের বাঁধনকে উপেক্ষা করে এ স্পর্ধার অট্টহাসি হেসে প্রকৃতির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব রে অসম্ভব! ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয় এ ধ্বংসের বন্ধুর পথ হতে! ...তোর প্রাণের অগ্নিবীণার এই যে আগুন-ভরা দীপক-রাগ আলাপ, এ যে তোকে পুড়িয়ে খাক করে ছাড়বে ভাই! মেঘমল্লারের স্নেহ-স্নিগ্ধস্পর্শ ছাড়া এ আগুন শান্ত করবে কে? যদি ধরা না দেওয়া, বাঁধন এড়ানোতেই তোর আনন্দ, তবে তো এ জীবন-ভরা চঞ্চলতা দিয়ে পথের ভ্রান্ত পথিকগুলোকে মুগ্ধ করিস কেন? লুব্ধা মৃগীকে মায়া-তানে বনের বাহির করে তাকে মৃগ-তৃষ্ণিকায় ফেলে যাওয়াটাই কি খুব বড়ো পৌরুষের কথা? এ কী পাণ্ডুর-পাংশু আনন্দ! জানি, তুই বলবি, 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ!' কিন্তু এতদিন ভুলেচি, আজ আর ও-ফাঁকির কথায় ভুলচিনে। আজ তোর এই বাদলের কান্না-ভরা চিঠিটা পড়চি, সেই সঙ্গে তোর অনেকদিনের অনেক কথা আমার মনের দিঘিতে বুদবুদ কাটচে, আর তারই সাথে মনে হচ্চে তোর মনের মানুষের এতদিনে যেন অনেকটা নাগাল পেয়েছি। পল্লিমাঠের 'ভুলনে ভূত'-এর মতো আর এ চতুর মনকে পথ ভুলোতে পারছিসনে, বলে রাখলাম। এইবার যেন বুঝতে পারচি, তোর পাষাণ বুকের ভেতর জ্বলচে লক্ষ আগ্নেয়গিরির অনন্ত বহ্নিশিখা ধুধুধু! তাকে আটকে রাখতে প্রয়াস পাচ্চে তোর ওই শক্তি অমানুষিক ধৈর্যের আবরণ। তোর হৃদয়-ভরা বেদনার রক্ত-ঢেউ পাঁজরের বাঁধ ভেঙে কণ্ঠের সীমা ছাপিয়ে উঠতে দিনের পর দিন উত্তাল বিদ্রোহ-তরঙ্গের সৃষ্টি

করচে। তারই রুদ্র-কান্না হাসি হয়ে তোর রুক্ষ অধর-ওষ্ঠে আছাড় খাচ্চে, হাঃ হাঃ হাঃ! শুধু হাসি – কাঠচোটা হাসি! আর প্রতারণা করতে পারবিনে রে আমায়, আর তুই মিথ্যা দিয়ে আমায় বারে বারে ঠকাতে পারবিনে ; আজ আমার আপন বেদনা দিয়ে তোর হাসি-কান্নার সত্য উৎস আবিষ্কার করেছি। তোর ব্যথার এ অফুরন্ত উৎস চেনা-পথিকদের ছেয়ে ডুবিয়ে ফেলেছে ; তোর ওই বেদনা-রাগ-রঞ্জিত পরশমনির ছোঁয়া আমারও লৌহ-মর্ম্মকে ব্যথা-কাঞ্চনের অরুণিমায় রাঙিয়ে তুলেছে! ওরে, তাই এ নিস্তব্ধ রাতে বিহ্বল-আমি একা-আমার আজ অন্তরের সত্য – মানবাত্মার সকল ভাবগুলি তোকে জানিয়ে বাঁচলাম। জানি এ চিঠিটা আমার হাত পেরিয়ে গেলেই হয়তো আমার সংকোচ আর অনুশোচনা জাগবে যে, তোকে এমন করে তোর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া বা চোরা-ব্যথায় অস্ত্র করা একেবারেই উচিত হয়নি। এ জেনেও আমার পত্র লেখার বলবতী ইচ্ছাকে রুখতে পারলাম না। কে জানে, আবার আমাদের নব মিলনের আনন্দ-ভৈরবী আর প্রভাতির কলমুখর রাগিণী কোনো প্রভাতে রনে উঠবে কিনা! আঃ, তার চিন্তাটাও কত ব্যথা-কাতর কান্নায় কান্নাময়। হায় ভাই, সেদিন কি আর আসবে?

বাড়ির সব খবর ভালো। মাহ্‌বুবা বিবি বর্তমানে মাতুলালয়-বাসিনী। সোফিয়া বিবি তেপসে-যাওয়া মালসার মতন নাকি আজকাল মুখ ভার করে থাকেন। রবিয়ল সাহেবের এসরাজ-সারেঙ্গির কোঁকানি একটু মন্দা পড়েচে। আমার এখন লেখাপড়ার চিন্তার চেয়ে বোঝাপড়ার চিন্তাটাই বেশি। – ওই যাঃ, একটা হুতুম-প্যাঁচা ডেকে উঠল রে – বড্ড অলুক্ষণে ডাক! শুয়ে পড়ি ভাই, মাথা নুয়ে আসচে!

তোর বিয়োগ-কাতর
মনুয়র

চ

করাচি সেনানিবাস,
(শ্রীঘর)
১৭ ফেব্রুয়ারি
বাঁদর মনো!

শুয়োর পাজি-ছুঁচো-উল্লু-গাধা-ড্যাম-ব্লাডিফুল-বেল্লিক-বেলেল্লা-উজবুক-বেয়াদব-বেতমিজ!– ওঃ আর যে মনে পড়ছে না ছাই, নইলে এ চিঠিতে অন্য কিছুই না লিখে শুধু হাজার খানেক পৃষ্ঠা ধরে তোকে আষ্টে-পিষ্টে গাল দিয়ে তবে কখনও ক্ষান্ত হতাম! একটা অভিধানও পাওয়ার জো নেই এই শালার জিন্দানখানায়, নইলে দিনকতক ধরে এমনিতর চোখা চোখা গাল পসন্দ করে তোকে বিঁধতাম যে, যার জ্বলনের চোটে তুই বিছুটি-আলকুসি-লাগানো ছাগলের মতন ছুটে বেড়াতিস – আর তবে না আমার প্রাণের জ্বালা হাতের চুলকুনি কতকটা মিটত! আচ্ছা, তোদের ভাই-বোন সবারই ধাত কি একই রকমের? তোদের ধর্মই কি মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া? তোরা কী সুখ পাস এমন বে-দিলের মতন বেদনা-ঘায়ে ভোঁতা ছুরি রগড়ে? বল, ওরে হিংস্র জানোয়ারের দল, বল এতে তোদের কোন্ জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়! কী বলব, ভাগ্যিস তুই আমার হাতের নাগালের মধ্যে নেই, নইলে কামড়ে তোর বুকের কাঁচা মাংস তুলে ছাড়তাম! হায়, আমার জান যে আজ কীরকম তড়পে তড়পে উঠছে তোদের এই মুরগি-পোষা ভালোবাসার জুলুমে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে না পেরে শুধু এই চিঠির কাগজটাকে কামড়িয়ে – নিজের হাতের গোশত নিজে চিবিয়ে আমার অতৃপ্ত রোষের ক্ষোভ মিটাচ্ছি! এখন আমার মনে হচ্চে, হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনের মতন মস্ত এক লাফে এই দু হাজার মাইল ডিঙিয়ে তোর ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোকে একদম 'কীচক-বধ' করে ফেলি। তোর ওই বাঁকুড়া কলেজটাকে গন্ধমাদন পর্বতের মতন চড়চড় করে উপড়ে ফেলে সটান গন্ধেশ্বরীর গর্ভে নিয়ে গিয়ে ফেলাই! তার পর ভাবিসাহেবার ঘরটাসুদ্ধ সারা সালারটাকে অযুত বিসুবিয়াসের অগ্নিস্রাবে একদম নেস্ত-নাবুদ করে ফেলি! ভারি সব পণ্ডিত মনস্তত্ত্ববিদ কিনা, তাই এইসব

ডেঁপোমি করে চিঠি লেখা! আমি নিজেকেই বা আর কী বলব, তোদর একটু পথ দেখাতেই তোরা ‘খাইবার-পাস’-এর মধ্যের গোরা সৈন্যের মতন সেই পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষণ করে আমাকে ঘায়েল করে ফেললি! যত দোষ এই আমি-শালার! তোর আগেকার চিঠিটা পেয়ে খুশি হয়ে যে উত্তর লিখেছিলাম, তা আলসেমি করে আর ডাকে দিইনি, তারপর তোর পরের বিশ্রী চিঠিটা পেয়েই তক্ষুণি সে-চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলেচি! মনে করেছিলাম, তুই ভালো, – আরে ‘তওবা’! সব শিয়ালের একই ডাক! পরের চিঠিটার পুরো উত্তর যে এখন দেবই না, তা বোধ হয় আর লিখে জানাবার দরকার নেই! যদি কোনোদিন আমি শান্ত হয়ে তোর অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, তবেই উত্তর দেব – নইলে নয়। ভাবিসাহেবার চিঠিও তোরই মতো ‘রাবিশ’-যতসব মনগড়া কথায় ভরা। হবে না? হাজার হোক, তিনি তো তোরই বোন! আর কাজেই তুইও যে তাঁর সহোদর, তা মর্দের মতই প্রমাণ করলি! ... খোদা তোদের মঙ্গল করুন!

তোদের খবর যদি ইচ্ছা করিস, দিতে পারিস। চিঠিপত্র বন্ধ করলে বা খবর না পেলে যে খুব বেশি চিন্তিত হব তা ভুলেও মনে করিসনে যেন। সেদিন আর নেই রে মনু, সেদিন আর নেই! এখন সারা দুনিয়া গোল্লায় গেলেও আমি দিব্যি শান্তভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিতে থাকব। জাহান্নামে যাক তোর এই দুনিয়া! আমার তাতে কী? দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী যে, আমি তার জন্যে ঝুরে মরব? মনে রাখিস, – দুনিয়া যদি হয় বুনো ওল, তবে আমি বাঘা তেঁতুল; দুনিয়া যদি হয় সাপ, তবে আমি নেউল: দুনিয়া যদি হয় রাধা-শ্যাম তবে আমি শ্রী কাঁধে-বাড়ি বলরাম!...আর কত বলব? কতই বা যা তা বকব! এক কথায়, আমি এখন থেকে সংসারের মহা শত্রু! সে যদি যায় পুবে, আমি যাব পশ্চিমে! এই তিন সত্যি করে দুনিয়ার সঙ্গে দুশমনি পাতালাম, দেখি কে হারে – কে জেতে ... দূর ছাই! রাজ্যের ঘুমও আসচে যেন একেবারে আফিমের নেশার মতন হয়ে, – একেবারে মরণঘুম এলেও তো বাঁচি! আর, ঘুমকেই বা দোষ দেব কী! হাবিলদারজি আজ যে রকম দু ঘণ্টা ধরে আমায় মাটি খুঁড়িয়েচে! এমন ‘কেঠো’ হাতেও ফোসকা পড়িয়ে তবে ছেড়েচে! – হাঁ, এই হাবিলদার কিন্তু এক ব্যাটাছেলে বটে! একেই তো বলতে হয় সৈ-নি-ক পু-রু-ষ! আমায় পুরো দুটি

ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ্ খাটিয়েচে, একবার কপালের ঘাম মুছতেও দেয়নি – এমনি জাঁক! অত কষ্টের মধ্যেও আমার তাই একটা তীব্র তীক্ষ্ম আনন্দ শিরায় শিরায় গরম হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল, এবং তা এই ভেবে যে, আহা আর কেউ তো এমন করে দুঃখ দিয়ে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দেয় না! এমনি কঠোরতা – না, এর চেয়েও সাংঘাতিক পরুষতা – আমি সব সময় চাইছি, কিন্তু পাই খুব কম! তাই আমার শাস্তির দরুণ ওই দু ঘণ্টা খাটুনি হয়ে যাওয়ার পর আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোর দুটো থাপ্পড় কষিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম! তীক্ষ্ণ উৎসাহের চোটে থাপ্পড় দুটো এতই রুক্ষ আর বে-আন্দাজ ভারি হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর চোখে সত্য সত্যই "ভুগজুগুনি' জ্বলে উঠেছিল! তাঁর চোখের তারা আমড়ার আঁটির মতন বেরিয়ে পড়লেও লজ্জার খাতিরে তিনি 'কিছুই হয়নি' বলে কাপাস-হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি সানন্দে স্বীকার করেছেন যে, আমি বাস্তবিকই তাঁকে একটু বেশিরকমই বেসামাল করে ফেলেছিলাম এবং তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, এরকম কারে পড়লে দিনেও তারা দেখা যেতে পারে! তবু এই হাবিলদারজিকে বাহাদুর পুরুষ বলতে হবে; কারণ অন্যান্য নায়ক হাবিলদারদের মতন সে অপরাধীকে না ঘাঁটিয়ে বসে থাকতে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে না – কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাই আমাদের সৈনিক-সংঘ এঁর নাম রেখেছে, পাষণ্ড দুশমন সিং। এ বেচারা লেখাপড়া জানে কম, কিন্তু 'নাচো কুঁদো ভুলো মৎ' অর্থাৎ কাজের বেলায় ঠিক – একদম ঘড়ির কাঁটার মতো! তাই আমাদের শিক্ষিত হামবাগের দল এখনও সাধারণ সৈনিক এবং ইনি শিগগিরই ভারপ্রাপ্ত সেনানী হতে যাচ্ছেন।... পলটনে এসে গাফেলিই তো এক মহা অন্যায়, তার ওপর ব্যাটাচ্ছেলের আবার দুর্বলতা দেখো দেখি – পাছে বাংলার ননীর পুতুলদের নধর গায়ে একটু আঁচ লেগে তা গলে যায়, তাই তাঁদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে উচ্চ সেনানীদের দিনকানা করা হয়। যেই কোনো লেফটেন্যান্ট কাজ দেখতে আসেন, অমনি তারা এমনই নিবিষ্ট মনে, এত জোরে কাজ করতে থাকেন যে, তা দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও 'সাবাস জোয়ান' বলবার কথা! কিন্তু সে যখন দেখে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা কাজ হওয়া উচিত ছিল, তার এক-চতুর্থাংশও হয়নি, তখন বেচারার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না! গভীর গবেষণা করেও তার গোবরগাদা মগজে এর কারণটা আর সেঁদোয় না – আর কাজেই তাকে বলতে হয়

'বাঙালি জাদু জানতা হ্যায়!' অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু এইরকম করে অনেকেই বাঙালি ছেলেগুলোর কাঁচা মাথা চিবিয়ে খাচ্চে। কাজেই আমার সঙ্গে এই ধরনের সব সৈনিকের প্রায়ই মুখোমুখি এবং সময়ে হাতাহাতিও হয়ে যায়, আর শাস্তি ভোগটা করতে হয় আমাকে সবসে জিয়াদা! রাজার জন্য কাজ নাই-ই করলি, কিন্তু এও তো একটা শিক্ষা! যে-সামরিক শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য বাঙালি এই প্রথম লাভ করেচে, তাকে এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের লোকের এত আশা, আমাদের প্রতি তাঁদের এত স্নেহ-আদরের সম্মান আমাদের প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে। প্রাণ তো দিতেই এসেছি, তাই বলে লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে কেন? এ-ভীরুতা যে সৈনিকের দুরপনেয় কলঙ্ক।... পুরুষ-কা বাচ্চা পৌরুষকে বিসর্জন দেব কেন? সৈনিকের আবার দয়া-মায়া কীসের? সিপাই-এর দিল হবে শক্ত পাথর, বুক হবে পাহাড়ের মতন অটল, আর বাহু হবে অশনির মতন কঠোর! – গর্দানে একটা 'রদ্দা' বসালেই যেন বুঝতে পারে, হাঁ পৃথিবীও ঘোরে, আর স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বলেও তিনটে ভুবন আছে! মরদের যদি মর্দানিই না রইল, তবে তো সে নিমোরাদে। মানুষের এরকম 'মাদিয়ানা' চাল দেখে মর্দমী আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

তার পর, আমার জন্যে বিশেষ কোনো চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই এখন সম্প্রতি মাসখানেকের জন্যে। কারণ, গত পরশু এক শুভলগ্নে আমি আমার কোম্পানির সেনানী এক কাপ্তেন সাহেবকে একই ঘুষিতে 'চাঁদা মামা' দেখিয়ে এখন বন্দীখানায় বাস করচি! বড়ো দুঃখেই তাঁর সঙ্গে এরকম খোট্টাই রসিকতা করতে হয়েছিল, কেননা তিনি কিছুদিন থেকে নাকি আমার প্যারেড ও কাজে অসাধারণ চটক, নৈপুণ্য এবং কর্তব্যপরায়ণতা দেখে আসছিলেন, তাই সেদিন যখন মেসোপটেমিয়া যাওয়ার জন্যে আমাদের 'বিবাহের খাকি-চেলি পরিধানপূর্বক' নববধূর মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আড়-চোখে-চোখে আমাদর পতিদেবতাস্বরূপ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের শুভাগমন প্রতীক্ষা করছি আর ঘেমে তেতে লাল হচ্চি – অবশ্য লজ্জায় নয়, খর চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরের তাপে, – তখন হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাদের কোম্পানির সুবাদার সাহেবকে বললেন যে, আমার

মেসোপটেমিয়া যাওয়া হবে না, নতুন রংরুটদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে এবং আমাকে ওই খেসরতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লান্সনায়কের পদে উন্নীত করা হবে। কথা শুনে আমার অঙ্গ জুড়িয়ে গেল আর কী! তাই তাঁর এ অন্যায় আবদারে প্রতিবাদ করায় তিনি বেদম খাপ্পা হয়ে চোখ রাঙিয়ে উঠলেন, – 'মেরা হুকুম হ্যায়!' তোর হুকুমের নিকুচি করেনি! জানিস তো পুরুষের রাগ আনাগোনা করে, – যেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠেচে, অমনি চোস্ত গোছের পরিপক্ব একটি ঘুঁষি সাহেবের বাম চোয়ালে, – তিনিও অবিলম্বে পপাত ধরণিতলে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পতন ও মূর্ছার' হাতে-কলমে অভিনয়! তারপর, আমায় ঠেলে ঢোকানো হল 'কোয়ার্টার গার্ডে' বা সামরিক হাজতে; তারপর বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও সামরিক গারদখানায় বাস! কুছ পরোয়া নেই।আমি এই সশ্রম কারাদণ্ডকে ভয় করলে আর জান দিতে আসতাম না। দুঃখকষ্টই তো আমার অপার্থিব চিরদিনের চাওয়া-পাওয়া ধন। ও যে আমার অলংকার! তাই হাসিমুখেই তাকে বরণ করে নিয়েছি! আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি সাহেবকে ওরকম আপ্যায়িত করেছিলাম কেন? তাতে আমি শুধু এইটুকু বলেছিলাম, – সাহেব ! সৈনিক হয়ে এসেচি মারামারি করবার জন্যই, প্রেম করবার জন্যে নয়!' তাছাড়া, দেখ না ভাই, একে আমার মনের ঠিক নেই এবং মনের সে তিক্ত ভাবটাকে কোনোরূপে চাপা দিতে চাইছিলাম দু-দিন বাদে আগুন দেখতে পাব এই আনন্দে, – আর ঠিক সেই সময় কিনা তিনি এসে আমায় 'কেতার্থ' করে দিলেন!

অতএব এখন কী করে আমার দিন কাটচে, আন্দাজেই মালুম করে নিতে পারবি। কিন্তু সে রকম ভাবতে পারাটাও তোমাদের অসামরিক লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ; কারণ, সৈনিকের খাটুনি ধস্তাধস্তি কুস্তাকুস্তিও দেখনি এবং তাদের মিলিটারি শাস্তি বা গারদখানার ধারণাও তোমাদের বুদ্ধির অতীত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। এখন খোদার নাম নিয়ে ভোরে উঠেই আমার গারদের ভিতর বসে হাত-পায়ের শিকলগুলো ঝংকার দিই। আহ্, সে কী মধুর বোল! আমার কানে তা যে কোনো তিলোত্তমা-তুল্যা ষোড়শী কুমারীর বলয় নূপুর ও রেশমি চুড়ির মধু শিঞ্জনের চেয়েও মিষ্টি হয়ে বাজে! তারপর শ্রীমান গুপিচন্দ্রের শিঙের (বিউগল্) আওয়াজ 'কখন শুনি কখন শুনি' করে যুগল কর্ণ উৎকর্ণ হয়ে

ওঠে। রাই বিনোদিনীর মতোই অহম পুং-বন্দিনী তখন হাঁশ-পাঁশ করে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের খাকি বসনও ভীতি-সংকোচে আন্দোলিত হতে থাকে এবং আয়ান ঘোষ-রূপ এই লান্সনায়েক নারাণ ঘোষের গোয়াল বা গারদঘরে বসে শুনি, – 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে!' অবিশ্যি, তা বন- মাঝে নয়, সন্ত্রস্ত মন-মাঝে! – হায়, সে কোন্ শ্যাওড়াতলায় হেলমেট-চূড়াশিরে রাইফেল-বংশী হাতে আমার সান্ত্রি-কালাচাঁদ ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে আছেন! আমার এই শ্যামকান্তের ত্রিভঙ্গ নাম সার্থক, কেনা বুটপট্টি পরার পর তাকে ঠিক তিন জায়গায়ই ভঙ্গ বলে মনে হয়। প্রথম, পট্টি-লেপটানো পায়ের উপরে হাঁটুতে 'দ'-এর মতো একটা ভঙ্গ; দ্বিতীয়, তাঁর কোমর-বন্ধের বাঁধনের ঠেলায় এবং কতকটা স্বভাবতই ভঙ্গ; তৃতীয়, তাঁর স্বর ভঙ্গ! আরও আছে, – তাঁর পৃষ্ঠদেশ অষ্টাবক্র মুনির মতন বাঁকা বলে আমরা তাঁর নাম দিয়েচি, 'ফ্লাগব্রোকেন' অর্থাৎ কিনা ধ্বজ-ভঙ্গ! কিন্তু ওই অষ্টাবক্রিয় ভঙ্গটাও হিসেবের মধ্যে ধরলে উনি চতুর্ভঙ্গ হয়ে যান বলে ওটা এখন ধরতার মধ্যে ধরিনে। ... হ্যাঁ, তার পর আমায় কী করতে হয় শোন। শ্রীদামরূপ ধড়া-ধারী তাঁর এক সখা এসে আমায় কালার গোষ্ঠে নিয়ে যান ; আমিও মহিষ-গমনে আনত নেত্রে তাঁর অনুগমন করি। পথের মাঝে আমার লাজবিজড়িত শৃঙ্খল-পরা চরণে পঞ্চমেবোলা বাণী বেজে ওঠে, – 'রিনিক ঝিনিকি রিনি ঝিনি রিনিঝিনি ঝিন্নিরে!' তার পর এই মুখর 'মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে!' পথের যুবকবৃন্দকে চকিত করে গোষ্ঠে গিয়ে ঘণ্টা দুই গোষ্ঠবিহার! অর্থাৎ শ্যামের হুকুম মতো সামনের একটা ছোট্ট তাল-তমালহীন পাহাড় বারকতক দৌড়ে (ডবল মার্চ করে) প্রদক্ষিণ করে আসা – সেই দৌড়ানোর মাঝে মাঝে 'ডবল মার্ক টাইম' করা বা শিব ছাড়া যে সৈনিকেও তাণ্ডব নৃত্য করতে পারে, তা দেখিয়ে দেওয়া, – মধ্যে পরিখা-খাল ডিঙিয়ে মর্কট-প্রীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি! এসব লীলা রে লীলা, একেবারে রাসলীলা! এই দুই ঘণ্টা অমানুষিক কসরতের পরেও যখন পৈতৃক প্রাণটা হাতে করে ঘরে ফিরি, তখন স্বতই মনে হয় – নাঃ, 'শরীরের নাম মহাশয়' হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়! এ মহাশয়কে যা সওয়াবে তাই সয়। তারপর বেলা এগারো-বারোটায় যে আ-কাঁড়া রেঙ্গুনি চালে সফেন ভাতের মণ্ড আর আ-ছোলা আলুর ঘেঁট খেতে পাই, তা দেখে আমরা বলদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণির জীব বলে তো মনে হয় না। ডাল যা দু-একদিন হয়, তাতে নাকে-কানে সরষের তেল দিয়ে ডুব

মারলেও কলাই-এর সন্ধান পাওয়া যাবে না! সকালে একবার ভেলি গুড় দিয়ে তৈরি এক হাতা যা চা পাই, তা না বলে দিলে বহু গবেষণাতেও কেউ চিনতে পারবে না যে, এ আবার কোন্ চিজ! এ যেন রোগীকে জবরদস্তি করে পথ্য গেলানোর মতো, 'খাবি তো খই খা, না খাবি তো খই খা!' যা হোক, অতক্ষণ খাবি খাওয়ার পর ওই জাব খাওয়াই তখন পরম উপাদেয়, অমৃত বলে বোধ হয়। তার পর একটু বাদেই পাথর কুড়ানো, ভাঙানো, আবার সন্ধ্যেয় ওই রকম প্যারেড বা গোষ্ঠবিহার এবং আরও কত বিশ্রী-সুশ্রী কাজ। সেসব শুনলে তোমার চক্ষু কাঁকড়ার মতন কোটরের বাইরে ঠেলে বেরিয়ে পড়বে।... তবু কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলচি বেড়ে আরামেই আছি। আমি এই পিঁজরা-পোলে আটক থেকেও কী করে হরদম গান গাই, তা এখানকার সান্ত্রিসংঘ বুঝে উঠতে পারে না। এই দ্যাখ না, তোকে চিঠি লিখতে বসেছি – আর সঙ্গে সঙ্গে গানও ধরে দিয়েছি, –

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারও,
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারও!

এই রকমে আমার দিনগুলো এখন যাচ্চে, 'আদম-গাড়ি'র (রিকশ) মতন একঘেয়ে হচং হচং করে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।

শুনচি, কয়েদ হওয়ার দরুণ আমায় নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেওয়া হবে না। যদি তা হয়, তাহলে আর এক কাণ্ড করে বসে থাকব। তা এখন বলছিনে। এ ব্যাটারা তো বুঝবে না যে, আমি কী জন্যে পলটনে এসেছি। তাই সকলেই শুধু ভুল বোঝে। অধিকাংশ সৈনিক যখন পদোন্নতির জন্য লালায়িত, তখন আমাকে প্রমোশন দিতে গেলেও আমি নিই না দেখে ওরা আমাকে 'কাঠখোট্টা', 'গোঁয়ার', 'হোড়' প্রভৃতি দুষ্পাচ্য গালাগালি দেয়। কিন্তু আমি জানি, দুঃখকে পাওয়ার জন্যেই আমি এমন করে বাইরে বেরিয়েচি। আমি রাজা ও দেশের জন্যে আসিনি। অত বড়ো দেবতা বা স্বার্থত্যাগী মহাত্মা হয়ে উঠতে পারিনি এখনও; আত্মজয়ই করতে পারলাম না আজও, তা আবার দেবতা! তাই আজও আমি রক্তমাংসের গড়া গোঁয়ার গর্দভ মানুষই রয়ে গেলাম।... পরে বরং দেবতা হওয়ার অভিনয় ও কসরত করে দেখা

যাবে, যদি এই দুঃখ-কষ্ট-বেদনার আরাম আর আনন্দকে এড়িয়ে চলতে না হয়। কেননা, শুনেছি, দেবতাদের দুঃখ-কষ্ট বেদনা-ব্যথা বলে কোনো জিনিস জানা নেই, যদি তাই হয়, তবে ও আনন্দ-বিহীন নির্বিকার দেবত্বকে দূর থেকেই হাজার হাজার সালাম! যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন যে বেনিমক, বিস্বাদ! এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে, আর আজও সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মতো উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে! দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়ব না। সে যে আমার বন্ধু – প্রাণপ্রিয়তম সখা, – আমার ঝড়-বাদলের মাঝখানে নিবিড় করে পাওয়া সাথি! এ পাওয়ার আনন্দের যে তীব্র নির্মমতাভরা মাধুর্য, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার সব শক্তি ওই পথে পাওয়া বন্ধু দুঃখই হরণ করেছে। তাই বাউল গানের অলস সুরে সামনের উদাসীন পথে আমার ক্রন্দন-আনন্দ একটা একটানা বেদনা সৃজন করে চলেছে, দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পানে প্রসারিত হয়ে গেচে সে-পথ। বুকের ভিতর ক্রন্দন জাগে তার সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে, ‘এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে?’ মূক পথের সীমাহীন আধ-আবছায়া আঁখির আগে ক্লান্ত চাওয়ার মৌন ভাষায় কইতে থাকে, ‘ তা কে জানে, তা কে জানে!’ এই অশেষের শেষ পেতে ততই প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। তাতেও কত আনন্দ! এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আর পথহীন পথচলার গূঢ় আনন্দ, তা থেকে আমার অতৃপ্ত আত্মতৃপ্তিকে বঞ্চিত করব কেন? তোরা অনুভূতিহীন আনন্দবিহীন পাথরের ঢেলা, – হয়তো একে ‘সোনার পাথর বাটি’ বা ‘কাঁঠালের আমসত্ত্ব’-এর মতোই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে প্রশ্ন করবি, ‘যার সীমা নেই, শেষ নেই সে অজানার পিছনে ছোটার আবার আনন্দ কী?’ ওই তো মজা! এই অসীমের সীমা খোঁজায়, নিরুদ্দেশের চেষ্টায় যে দীর্ঘ অতৃপ্তির আশা-আনন্দ, সেই তো আমার উগ্র আকাঙ্ক্ষার রোখ চড়িয়ে দিচ্চে। শেষ হলে যে এ পথ চলারও শেষ, আর আমার আনন্দেরও শেষ, তাই আমি পথ চলি আর বলি, – যেন এ পথের আর শেষ না হয়। পাওয়ার আনন্দের শান্তির চাইতে, তাই আমি না-পাওয়ার আনন্দের অশান্তিকেই কামনা করে আসচি। যার জন্যে আমার অগস্ত্য-যাত্রা, আমার সেই পথ-চাওয়া ধনকে কি এই পথের পারেই পাব? সেও কি তবে আমার আশায় এই সীমার শেষে তার অনন্ত যৌবনের ডালি সাজিয়ে জন্ম জন্ম প্রতীক্ষা করে কাটাচ্চে?

শুধু আমিই তাকে পেতে চাই? সে কী পথ চলে না আমার আশায়? না, না, সেও পেতে চায়, সেও পথ চলে; নইলে কে আমায় আকর্ষণ করবে এমন চুম্বকের মতো? কীসের এমন উন্মাদনাস্পন্দন আমার রক্তে-রক্তে টগবগ করে ফুটচে? – তার বাঁশি আমি শুনেচি, তাই আমার এ অভিসার যাত্রা ; আমার বাঁশি সে শুনেচে, তাই তারও ওই একই দিক-হারা পথে অভিসার-যাত্রা! আমি ভাবচি আমার এ-যাত্রার শেষ ওই পথহীন পথের অ-দেখা পথিকের কুটিরদ্বারে, – পথের যে-মোহনায় গিয়ে পথহারা পথিক ওই চেনা বাঁশির পরিচিত বেহাগ-সুর স্পষ্ট শুনতে পায়। সে বেহাগ-রাগে মিলনের হাসি আর বিদায়ের কান্না আলো-ছায়ার মতো লুটিয়ে পড়ে চারিপাশের পথে। কারণ, ক্লান্ত পথিক এই চৌমাথায় এসে মনে করে, বুঝি তার চলার শেষ হল; কিন্তু সেই পথেরই বাঁক বেয়ে বেহাগের আবাহন তাকে অন্য আর এক পথে ডেকে নেয়। তার পর সকালের পথ তাকে বিভাসের সুরে, দুপুরের পথ সারঙ-রাগে আর সাঁঝের পথ পুরবির মায়াতানে পথের পর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়! হায়, একী গোলকধাঁধা? কোথায় সে পথের বধুঁ যার বাঁশি নিরন্তর বিশ্বমানবের মনের বনে এমন ঘর-ছাড়া ডাক ডাকচে? যার অশরীরী ছোঁয়া শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সারাক্ষণই বাইরে-ভিতরে অনুভব করচি, যে শুধু দুষ্টুমি করে পথই চলাচ্চে, ধরা দিয়ে ধরা দিচ্চে না? পেয়েও তবে এই না-পাওয়ার অতৃপ্তি কেন? এর সন্ধান কে দেবে? যে যায়, সে তো আর ফেরে না। এ অগস্ত্য-যাত্রার মানে কী?...

দুঃখ বলেছে সে আমাকে ওই পথের শেষ দেখাবে। সে নাকি আমার ওই বঁধুয়ার সখা। কোন্ পিয়াল বনের শ্যামলিমার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে চোর-চপল তার বাঁশি বাজাচ্ছে, তাই সে দেখিয়ে দেবে! তার সাথে গেলে সে এই লুকোচুরি ধরিয়ে দেবে। তাই দুঃখকে বরণ করেছি, তাকেই আমার পথের সাথি করেছি। সুখে যে-ক্লান্তি আছে, এ দুঃখে তা নেই; এর বেদনা একটা বিপুল অগ্নি-শিখা বুকের মাঝে জ্বালিয়েই রেখেছে – সে-শিখা ঝড়ে নেবে না, বাদল-বর্ষায় ঠান্ডা হয় না। এই আগুন-শিখার নামই অশান্তি। আমার জীবন-প্রদীপ ততক্ষণই জ্বলচে আর জ্বলবে, যতক্ষণ এই অশান্তির 'রওগন' বা স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেচে আর রাখবে। আগুন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা – এই অষ্টধাতু দিয়ে

আমার জীবন তৈরি হচ্চে, যা হবে দুর্ভেদ্য – মৃত্যুঞ্জয় – অবিনাশী! – আমার এ-পথ শ্বাশত সত্যের পথ, – বিশ্বমানবের জনম জনম ধরে চাওয়া পথ। আমি আমার আমিত্বকে এপথ থেকে মুখ ফিরাতে দেব না। পথ-বিচ্যুতি ঘটাতে সুখ তো প্রলোভন দেখাবেই ; কেননা তার দুশমন ‘দুঃখ’ যে আমার সাথি। কিন্তু আর ফিরছিনে। এই যে দুঃখের বুক আঁকড়ে ধরেচি, এ আর ছাড়চিনে! আমি আজ আমার এই বিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা এবং দশ-বিশে দুশো বছরেরও বেশি আঘাত-বেদনা নিয়ে সত্য করেই বুঝেছি যে, দুঃখী যখন আনন্দকে পেতে সুখের পেছনে মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের মতন অনুসরণ করে, তখন সে তার দুঃখের দৌলতে যে আনন্দটুকু পেয়েছিল তা তো হারায়ই, উলটো সে আরও অনেকখানি পেছনে অসোয়াস্তির গর্তে গিয়ে পড়ে। তার পর তাকে সেই আগে-চলা দুঃখের পথ ধরেই চলতে হয়। মৃগ তৃষ্ণিকার মতো সুখ শুধু দূর-তৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথাও নেই – সুখ বলে কোনো চিজের অস্তিত্বও নেই ; ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্যে কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেওয়ার মতো ফুসলিয়ে রাখা। আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পারে।...

ওহ্, মাথাটা বড্ড দপদপ করচে রে। গা-টাও শির শির করচে। কী লিখতে গিয়ে কী যে ছাই-পাঁশ এক ঝুড়ি বাজে বকলাম, তা ভেবে উঠতে পারছিনে। চিঠিটা আর একবার যে পড়ে দেখতে পারব তারও কোনো আশা নেই, এমনই শরীর-মনে অবসাদ আসচে। তার ওপর আবার আর এক জুলুম, করাচিতে এখন খুব বসন্ত আরম্ভ হয়েচে, খোদা এখন দুনিয়ার কিছু খরচ কমাতে ইচ্ছে করেন বোধ হয়। বসন্ত-রোগাক্রান্ত রোগীর চেয়ে যাদের বসন্ত হয়নি, তাদের জুলুমেই আমরা সুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমাদের লাইনের ওপারেই ‘সোলজার বাজার’ বলে একটা জায়গা আছে সেখানেই বসন্তভীতু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলে এমন বীভৎস কণ্ঠে হরি-সংকীর্তন করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সামনের সাগর-শয়ান নারায়ণকে মুগ্ধ করে প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা করচে যে নারায়ণের যদি এতটুকুও সংগীত-জ্ঞান থাকে, তাহলে এতক্ষণ তিনি শ্বশুরবাড়ি ক্ষীরোদ সাগরের আয়েশ, লক্ষ্মীর পরিচর্যা ইত্যাদি সব কিছু ছেড়ে সোজা আমেরিকা-মুখো হয়ে ছুট দিয়েছেন। লক্ষ্মী সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনে, কেননা তাঁর সতিন ব্যতীত তাঁর সংগীত-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার

সঠিক কোনো খবর জানা নেই। নারায়ণ দেখেন যে, দায়ে দৈবে না পড়লে এইসব মনু-সন্তানগণ তাঁর প্রতি অতিভক্তি দেখিয়ে চোরের লক্ষণ প্রকাশ করে না, বা তাঁর সুখ-নিদ্রার ব্যঘাত জন্মায় না, তাই তিনি অনেক সময় সমস্যায় পড়ে যান যে, তাঁর শ্বশুরালয় –সমুদ্রের গভীরতা বেশি, না এই ভক্তগুলি ভক্তির গভীরতা বেশি! আর, তাঁর এইরকম সমস্যা সমাধান করতে করতে ততক্ষণে অসহায় মানবকুলের অবস্থা 'গুড়োয় মুড়ি দু-আঙুল' গোছ হয়ে পড়ে এবং তাই তারা খঞ্জনি বাজিয়ে খোল পিটিয়ে ছাগ-মোষ বলি দিয়ে জোর চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়!

যাক, নারায়ণ তো এখন এইরকম কোনো প্রকারের লটপটিয়ে এক দিকে ছুট দিয়েচেন, কিন্তু এদিকে 'গোদের উপর বিষফোড়া'র মতো আর এক আপদের আমার নাকের ডগায় অভিনয় হচ্চে। আমাদের খাকি-গেরুয়াধারী অতি ভক্ত সৈনিকবৃন্দ 'হরির কৃপায়-দাড়ি গজায়, শীতকালে খায় শাঁখালু' শীর্ষক ভক্তিরসাপ্লুত কীর্তনগানের সাথে সাথে 'কাছা খুলে বাহু তুলে' যেরকম প্রলয় নৃত্য শুরু করে দিয়েচে, তাতে নিঃসন্দেহে মহাদেবও তাঁর ভূত-প্রেত-বলদাদিসহ কৈলাস-হিমালয় ছেড়ে এতক্ষণে তিব্বত পেরিয়ে পড়েছেন। খোলের প্রচণ্ড চাঁটির মাঝে মাঝে 'গিজাং তাল ভটাভট' গোছের একটা সমস্বর তীক্ষ্ণ ঋষভ চিৎকারের চোটে 'ওই – নিলে রে' বলে তাঁর ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনীপর্ব যেমন অস্বাভাবিক ছুট ছুটচে, হরগৌরীপৃষ্ঠে ঊর্ধ্ব-লাঙ্গুল বৃষভ সিংহও পিট-টান দিয়েচে তেমনই উল্কা বেগে, – এ আমি আমার মনের চোখে বায়োস্কোপের মতো সাফ দেখতে পাচ্চি! আজ আমি নেই বলে ওদের দলে কেউ আর 'ন্যাংটা নিতাই' সাজতে পারেনি। আমার হাত-পা নিসপিস করে উঠচে – মনে হচ্চে এই হাজতখানার লোহার শিকলগুলো ভেঙে ওদের মাঝে গিয়ে খুব এক চোট দড়াম দড়াম করে উলঙ্গ নাচ নেচে দিয়ে আসি। …

থাক – বাপ্স্! এসব প্রলয়কাণ্ড এতক্ষণে একটু শান্ত হল!…

আজ বুঝি অমাবস্যার রাত্তির। নিবিড়-কালো যামিনী। আকাশের ছায়াপথ দেখে মনে হচ্চে, ও-ছায়াপথ যেন এই কালো যামিনীর সিঁথিপাটিপরা সিঁথি। অস্তোন্মুখ

সন্ধে-তারা সেই সিঁথির মুখে সতীর জালে সিন্দূর বিন্দুর মতো রক্তরাগে জ্বলচে। তার এলিয়ে-দেওয়া কালো চুলের মাঝে মাঝে তারায় ফুল গোঁজা রয়েচে। আকাশ-বেয়ে পড়া ওই গভীর কালো এলোকেশের কুঞ্চিত রাশ ধরণির বুকে-মুখে লুটিয়ে পড়েচে। এক একটা তারা খসে পড়চে আর মনে হচ্চে অসংবৃত এই কালো রূপসির মাথা থেকে অসাবধানে এক আধটি করে কুসুম খসে পড়চে।... কোন্ কান্তের আশায় রজনি রোজ তার এ কালো রূপ নিয়ে অভিসারে বেরোয়? কেন সে অনন্তকাল ধরে এমন যামিনী জেগে আসছে? কোন্ আলো-করা-রূপের রাজকুমারের আসার আশায় তার প্রতি রজনি এমন করে ভোরের পাণ্ডুর ক্লান্ত হাসিতে মিলিয়ে যায়? প্রভাতের ভৈরবী-সুর-সিক্ত শীতল বায়ু – হা হা স্বরে যেন তারই না-পাওয়ার নিরাশা-ক্লান্তি আর পাওয়ার আশার আনন্দ ব্যক্ত করে। যামিনীর যেমন এ-প্রতীক্ষার অন্ত নেই, আমারও তেমনি এ পথ-চলার আর শেষ নেই!...

আমার এত ইচ্ছে করচে এই যামিনী অভিসারের আশা-নিরাশা নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখতে, কিন্তু – আ রে তওবা, আমার কবিতা লেখা যা আসে, তা কতকটা এই রকম, –

নেবুর ফুল আর করমচা,
লাও এক কাপ গরম চা!

এইবার ‘ক্ষেমা’ দিই, হাতে খাড় ধরে গেল। তোরও নিশ্চয় মুখে ব্যথা ধরবে পড়তে। এইবার ‘শ্রান্ত বায়ে ক্লান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।’

যদি কষ্ট দিয়ে থাকি ক্ষমা করিস।

স্বেচ্ছাচারী
নূরুল হুদা

ছ

সালার,
১২ই ফাল্গুন
ভাগ্যবতীসু,

আমার বুক-ভরা স্নেহ-আশিস নাও। তারপর কীগো সব ‘কলমিলতা’ ‘সজনে ফুল’-এর দল, বলি – তোমরা যে-লতা যে-দলই হও তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু পথের পাশের এই ‘আলোক-লতা’, ‘ঘলঘসি ফুল’ দু-একটারও তো সেই সঙ্গে খবর নিতে হয়। তাতে তোমার হয়তো কলসিভরা ভালোবাসাতে খাঁকতি পড়বে না। পোড়াকপাল আমাদের ভাই, তাই আমাদের আর কোনো লতা-পাতা ফুল-ফল জুটল না। সে যা-ই হোক, এখন তোমার গুর্বী এই গরিব “ভাবিজি’কে কি এক-আধখানা চিঠি-পত্তর দেবে? না, তাতে তোমার সখা-সখীর মধু-চিন্তায় বাধা পাবে? এখন তোমাদের সই-এ সই-এ কত কথাই না হবে, আমাদের মতো তৃতীয় ব্যক্তির তাতে শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকাই সার। এখন ‘সজন সজন মিল গিয়া, ঝুট পড়ে বরিয়াত!’ আচ্ছা, দেখা যাবে, – এক মাঘে শীত পালায় না! যদি তোমায় এই ঘরে আনতে পারি, তা হলে এই একচোখোমির হাড়ে-হাড়ে শোধ তুলব। মনে থাকে যেন, আমি এখন এই ঘরের কর্ত্রীঠাকুরণ!

…আহা, যাক, ও-সব কথা। ‘ভাবি’র দাবি নিয়ে ননদের সাথে একটু রঙ্গ-রসিকতা করে নিলাম বলে তুমি রাগবে না হয়তো? মনে কোরো না যেন যে, তুমি পত্র দাওনি বলে আমি সত্যি-সত্যিই রেগেছি বা অভিমান করেচি। আমি এখানে সুখে দুটো ভাত গিলছি বলে যে অন্যের বেদনও বুঝব না, খোদা আমায় এমন মন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি। তুমি যে-কষ্ট পাচ্ছ সেখানে, তাতে আমায় পত্র না দিতে পারাটাই স্বাভাবিক। তবে ফিরতি বারে কোনো লোক যদিই আসে আর তুমি সুবিধে করতে পার, তবে অন্তত গোটাকতক জরুরি কথাও লিখে পাঠিয়ো। সে জরুরি কথা আর কিছু নয়, কেবল নূরুল পলটনে যাওয়ার আগে পরে কোনো চিঠি-পত্তর খবরাদি রাখ কিনা, তাই একবার লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আমায় জানিয়ো।

অবশ্য, এরকম অনুরোধ করাটা বেজায় বেহায়াপনা, এর উত্তর দেওয়াটাও তোমার পক্ষে আরও বেশি লজ্জাকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু বোন, বড়ো দায়ে পড়েই এরকম বেহুদা অনুরোধ করতে হচ্চে তোমায়। তুমি আমাদের আর নূরুর সমস্ত অবস্থাটাই বুঝচ, কাজেই এ সময় – এই মরণ-বাঁচনের কথায় লজ্জা করলে চলবে না। এখন নূরুকে ফিরিয়ে বাঁচিয়ে আনার জন্যে আমাদের চেয়ে তোমার দায়িত্বটাই বেশি, – কেমন? যদি পার, একবার একটা চিঠি দিতে পার তাকে? ইস্, এতক্ষণ বোধহয় শরমে লাল হয়ে উঠেছিস? ওগো, এমন 'পেটে ভুখ্ মুখে লাজ' করলে চলবে না! নিজের জিনিসকে যদি নিজে অবহেলা করে হারাও, তা হলে আখেরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্চি! তোমার মনের সত্যিকে বাইরে প্রকাশ করবার শক্তি যদি থাকে, তাহলে এই লোক-দেখানো লৌকিকতার মুখ রাখতে গিয়ে কি নিজে ভিখারিনি সাজবে? অবশ্য, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখতে বলছিনে, শুধু দু-চারটি লাইনে সোজা কথা, – 'কেমন আছেন, খবর না পেয়ে বড্ড ছটফট করছি!' ব্যস! তা হলে দেখবি, আমি বলে রাখলাম, এতেই সে খুশির চোটে একেবারে দশ লাফ মেরে উঠবে।

সব কথা বলবার আগে এইখানে আমার দোষটা আগে প্রকাশ্যে কবুল করে ফেলি, নয়তো তুমি আমার কথার ধরন-ধারণ দেখে গোলকধাঁধায় পড়ে যাবে। দোষটা আর কিছু নয়, কেবল সোফিরা বাক্স থেকে তোমার চিঠিটা অতি কষ্টে চোরাই করে পড়ে ফেলেছি! অবশ্য, অন্য কাউকে তা দেখাইনি বা শুনাইনি। এটা পড়বার পরে হয়তো দোষের বলে ভাবতে পারি, কিন্তু অন্তত চিঠিটা গাপ করবার সময় এ কথাটি মনে হয়নি। পাছে আমার এ রকম ত্রুটি স্বীকারে 'ঠাকুর ঘরে কে রে, – না, কলা খাইনি'- রূপ হাস্যাস্পদ কৈফিয়তের সন্দেহ তোমার মনটাকে সশঙ্ক চঞ্চল করে তোলে, তাই এই আগে থেকেই কৈফিয়ত কাটলাম। তুমি এতে রেগো না বোন। কারণ আমি নিঃসন্দেহে ঘোষণা করতে পারি যে, মেয়েদের এই চুরি স্বভাবটা কিছুতেই যাবে না, তা তাঁরা এটা এড়িয়ে চলবার যতই কেন কসরত দেখান না। 'ইল্লত যায় না ধুলে, আর খসলৎ যায় না মলে এই ডাক-পুরুষে কথাটি একদম খাঁটি সাচ্চা বাত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতিতে যে-সব বাছা-বাছা চিজ চুরি করার অপরাধে অপরাধিনী করা হয় (যেমন কী, মন চুরি, প্রাণ চুরি ইত্যাদি) আমি

সে-সব চুরির কথা বলছিনে, কিন্তু মেয়েদের এই চুরি করে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনা, চুরি করে দেখা, চুরি করে অন্যের পত্রটি বেমালুম গাপ করে নিদেনপক্ষে একবার পড়ে নেওয়া, এই চুরিগুলো যে ভদ্র- মহিলা ঝুটা বলে উড়িয়ে দেবেন তিনি যে সত্য কথা বলছেন না, এ আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি! এ বিদ্যা যে আমাদের মজ্জাগত, জন্মগত। যাক –।

তোমার চিঠিতে যা সব লিখেছ, তা নিয়ে আর তোমায় লজ্জা-রাঙা করে তুলব না। আমার পক্ষে ও আলোচনা অন্যায়, কেননা আমি নাকি তোমার মহামাননীয়া ভাবি সাহেবা, পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ একাধারে দুটো মস্ত আদব-কায়দা দাবি-দাওয়াকারিণী। তোমাদের মতো এরকম বিশ্রী হলেও কই আমি তো তোমাদের কখনও এরকম বিশ্রী শিক্ষা দিইনি। আমি ভালোবাসতে স্নেহ দিতে শিখিয়েচি, কিন্তু ভয় করে ভক্তি করাটা কখনও শিক্ষা দিইনি। অবশ্য আমায় ভালোবাস, না ভক্তি কর, জানি না। যদি কোনোদিন ওরকম পাঠশালের ছেলের গুরুমশাইকে ভক্তি করার মতো আমাকে ভয়-ভক্তি করে থাক, তবে এখন থেকে আর তা কোরো না! এটুকু না লিখে পারলাম না বলে তুমি যেন কষ্ট পেয়ো না।

তোমার দুঃখ-কষ্টের কথাগুলি আমার বুকে তিরের ফলার মতো এসে বিঁধেচে। তুমি কি বুঝবে মাহ্‌বুবা, আমি যখন আসি তুমি তখন ছিলে পাড়াগাঁয়ের সাদাসিদে অশিক্ষিতা সরলা বালিকা, আমিই যে তোমায় এত কষ্ট করে এতদিন ধরে মনের মতোটি করে গড়ে তুলেছি। তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমার নববধূ কালটা বড্ড আনন্দেই কেটে গিয়েছে। সোফিটা বড়ো দুষ্টু, সে তো আর তেমন শিখতে পারলে না, কিন্তু তোমার ওই বিদ্রোহ-অভিমান-মাধুর্যের সাথে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ আমায় তোমাকে একটু বেশি করেই ভালোবাসতে বাধ্য করেছিল। তার পর যখন শুনলাম তুমি আমাদেরই ঘরের বউ হয়ে থাকবে, তখন সে কী যে আনন্দে আর গর্বে আমার প্রাণ শতধারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে বললে তুমি হয়তো বাড়াবাড়িই মনে করবে। আগে যখনই মনে হত, আমার পোষা-পাখি-তুমি হয়তো অন্য কারু সোনার খাঁচায় বন্দিনী হয়ে কোন্ দূরে দেশে চলে যাবে, তখন একটা হিংসুটে বেদনায় যেন আমি বড্ড অসুস্থতা অনুভব করতাম। এ ভাবটা কিন্তু আমার

মনে জেগেছিল নূরুল হুদা আমাদের বাড়ি আসবার পর থেকে। তোমাদের দুজনকে দেখলেই আমার মনে মধুর একটা আকাঙ্ক্ষা রঙিন হয়ে দেখা দিত, কিন্তু নূরুর খাম-খেয়ালির ভয়ে, আর বনের পাখি পাছে আবার বনে উড়ে যায় এই শঙ্কায় আমি কোনো দিনই এ কথাটা পাড়তে সাহস করিনি। আমার এ মন-গুমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল, তখন সবাইকে বলে- কয়ে বুঝিয়ে এক রকম ঠিক করলাম, কিন্তু বনের পাখি পোষ মেনেও মানলে না। সে চলে গেল! মিঠা আর আঠা এই দুটোর লোভকেও সে সামলাতে পারছিল না, কিন্তু শেষে ডানা-কাটার ভয়টাই তার হয়ে উঠল সবচেয়ে বেশি, তাই সে উড়ে গেল! আমার এই অতিরিক্ত স্নেহের বাড়াবাড়ির জন্যে আজ আমার যা কষ্ট, তা এক আল্লাই জানেন বোন, আর আমিই জানি। এক এক দিন সব কথা আমার মনে হয়, আর বুক ফেটে পড়বার মতন হয়ে যায়! তোদের দুইজনের কাকে যে বেশি স্নেহ করতাম, তা কোনোদিন আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না, তাই তোরা দুটিতেই আমার চোখের সামনে থাকবি, আমোদ-আহ্লাদ করবি আর আমারও দেখে জান ঠান্ডা হবে, চোখ জুড়াবে ভেবেই এমন কাণ্ড করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হয়ে গেল আর এক! এই যে মধ্যে গোলমাল হয়ে এত বড়ো একটা তাল পাকিয়ে গেল এতেও আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি, আমার যেন আশা হচ্চে খোদা তোদের দু-হাত এক করবেন। ... কিন্তু এইখানে একটা মস্ত কথা মনে পড়ে গেল ভাই, সত্যি কথা বলবি বোন আমার? নূরুর পলটনে চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে তোকে যেন কেমন মন-মরা দেখাচ্চিল, – কী যেন চাপা ব্যথা তোর দেহে কাজে-কথায় অলস-ম্লান হয়ে তোকে মুষড়ে দিচ্ছিল, – আচ্ছা, আমার এ ধারণাটা সত্যি নয় কি? আজ এত দিনে এ কথাটা বলছি, তার কারণ তখন আহ্লাদের আবেশে ওটা আমি দেখেও দেখিনি। দেখলেও ভুল মনে হয়েছিল যে, বিয়ের আগে জোয়ান মেয়ের ওরকম হওয়াটা বিচিত্র নয়। তাই তখন যেন তোর ও মলিনমূর্তি দেখেও বেশ আলাদা রকমের একটা সুখ অনুভব করতাম। মানুষ কাছে থাকলে তাকে ঠিক বুঝে উঠবার অবসর হয়ে ওঠে না, তার নানান কাজ নানা হাব-ভাব কথা-বার্তা ইত্যাদি বাইরের জিনিসগুলোই মনকে এমন ভুলিয়ে রাখে যে, সে তার ভিতরকার কাজ অন্তরের আসল মূর্তিটার কথা একেবারেই ভেবে দেখতে পায় না। তার পর সে যখন চলে যায়, তখন তারই ওই কাজের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি অবসর-চিন্তায় এসে বাধা দেয়,

আর তখন একে একে বদ্ধফুলের হঠাৎ পাপড়ি-খোলার মতন তার অন্ধদৃষ্টিও যেন খুলে যেতে থাকে এবং ক্রমেই সে তার অন্তরের অন্তরতম ভাবগুলিকে যেন বুঝতে পারে। তাই আজ তোরা দুজনেই যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলি তখনই বুঝলাম যে, নাঃ, তোদের দুজনেরই মাঝে কী যেন একটা বেদনার ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছিল, যেটার সীমা আজ কেউ দেখতে পাচ্চিনে। কী সে ব্যবধান? কী হয়েছিল তোদের? বলবি বোন আমার? বলবি ভাই আমায়?

জানি না বোন, তোদের এই বেহেশ্তের ফুল দুটির পবিত্র ভালোবাসায় কার অভিশাপ ছিল। তোরা যে উভয়ে উভয়কে হৃদয়ের নিভৃততম মহান আসনে বসিয়ে বুকের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে অর্ঘ্য বিনিময় করতিস, তা আমার চক্ষু কোনোদিনই এড়ায়নি। তোরা হাজার ছল-ছুতো আসিলা করে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে 'না – না' বললেও – ওরে, তোদের প্রাণের ভাষা যে চোখে-মুখে লাল অক্ষরে লেখা হয়ে ধরা পড়ত! পুরুষদের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এ জিনিসগুলো মেয়েদের চোখ এড়ায় না, তা তারা যতই উদাসীন ভাসা-ভাসা ভাব দেখাক। তার কারণ বোধ হয়, এদিক দিয়ে অধিকাংশ মেয়েই ভুক্তভোগী। তাছাড়া, মেয়েদের আবার মন নিয়েই বেশির ভাগ কারবার। স্নেহ-ভালোবাসা – সোহাগ-যত্ন রাতদিন তাদের ঘিরে রয়েছে, তাদের বুকের ভেতর ঝরনাধারার মতো নানান দিকে পথ কেটে বিচিত্র গতিতে বয়ে চলেছে আর সহস্র ধারায় বিলিয়েও এ অফুরন্ত স্নেহ-দরদ তাদের এতটুকু কমেনি। সে-কোন্ অনন্ত স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত যেন এ নিঝর-ধারা উৎস! আমরা মা বোন স্ত্রী কন্যা বধূ হয়ে সংসার-মরুর আতপতপ্ত পুরুষ-পথিকের পথে মরূদ্যান রচনা করছি, তাদের গদ্যময় জীবনকে স্নেহ-কবিতা সৌন্দর্য-মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলছি, তাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে দিচ্ছি, – ভালোবাসা দিয়ে সব গ্লানি সব ক্লান্তি সব নৈরাশ্য দৈন্য-আলাই-বালাই মুছে নিচ্ছি, – আমাদের কাছে তাই ফাঁকি চলে না! আমরা সবজান্তার জাত।... তাই, আমি তোদের এই চোরের মতো সন্ত্রস্তভাব দেখে (আর, বড়ো লজ্জার কথা, সেই সঙ্গে তোর বেহায়া ভাইঝিও) মুখ টিপে হাসতাম। মানব-প্রাণের এই যে বাবা-আদমের কাল থেকে সৌন্দর্যের প্রতি প্রাণের প্রতি মানুষের টান, প্রাণের টান, গোপন পূজা – একে মানুষ কখনও ঘৃণা করতে পারে না ; অবশ্য

নীচমনা লোকেদের কথা বলছি না। তাই তোদের দুজনারই মধ্যে ওই যে একটা মজার টানা-হেঁচড়ার ভাব, লাজ-অরুণ সংকোচ আর সবচেয়ে ওই ঘটি-বাটি-চুরি-করা ছেঁচকি চোরের মতো ‘এই বুঝি কেউ দেখে ফেললে রে – এই ধরা পড়লাম রে’ ভাব আমাদের যে কী আনন্দ দিত, তা ঠিক বোঝানো যায় না। বিপুল একটা তৃপ্তির গভীর স্বস্তিতে আমাদের দুজনারই বুক ভরে উঠত। তোর সদানন্দ ভাইটির তো দু-এক দিন চোখ ছলছল করে উঠত। আর পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে অপ্রতিভ হয়ে যান, তাই তাড়াতাড়ি ‘ধ্যেৎ, চোখে কী-ছাই পড়ে গেল’ বলে চোখ দুটো কচলাতে থাকতেন, নয়তো এসরাজটা নিয়ে সুর বাঁধায় গভীর মনোনিবেশ করতেন। আহা, খাপছাড়া আশ্বিনের এক টুকরো শুভ্র সজল চপল মেঘের মতো নূরু, যা কভু জমে হয়ে যায় শক্ত তুহিন, আবার গলে ঝরে পড়ে যেন শান্ত বৃষ্টিধারা, – মন্দার-পারিজাতের চেয়েও কোমল, পাহাড়-ছোটা-ঝরনা-মুখের চেয়েও মুখর, শিশুর চেয়েও সরল হাসিভরা, পবিত্রতা-ভরা প্রাণ, স্নেহহারা বাঁধন-হারা নূরু, – সে আবার সংসারী হবে, তোর কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ইন্দ্রধনুর সুষমা-মহিমা আঁকা যাবে, – ওঃ, সে কী দৃশ্য বেহেশ্‌তে হুর-গেলেমান, বা স্বর্গে অপ্সরি-কিন্নরী বলে কোনো প্রাণী থাকলে এ খোশখবরের ‘মোজদা ’ তারা স্বর্গের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে এসেছিল, মেওয়া-মিষ্টির খাঞ্চা ঘরে ঘরে ভেট দিয়েছিল!

আমরা তোদের এই পূর্বরাগকে কেন প্রশ্রয় দিতাম জানিস? হাজার অন্দরমহলের আড়াল-আবডালের ছাপা থাকলেও আমাদের অনেকের জীবনেই এমন একটা দিন-ক্ষণ আসে, যখন একজনকে দেখেই প্রাণের নিভৃত পুরে কোনো অনুরাগের গোলাবি ছোপের দাগ লেগে যায়। এ অনুরাগ আবার অনেক সময় ভালোবাসাতেও পরিণত হতে দেখা যায়, আর সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তা কারুর হয়তো সফল হয়, কারুর বা সে আশা মুকুলে ঝরে পড়ে, আবার কেউ হয়তো সাপের মানিকের মতন মর্মর মর্মে তাকে আমরণ লুকিয়ে রাখে, – তার অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। আমার কথা তো জানিস। আমার বাবাজান যখন সাবজজ হয়ে বাঁকুড়ায় বদলি হলেন, তখন আমার বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না। তখনও আমি থুবড়ো। তাই মাজানের চাড়ে আমার শাদির

জন্যে বাবাজান একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজকাল বাপ-মা-রা মহাজন-বিদায় বা ঘরের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলার মতোই যেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায়, ব্যস্ত হয়ে পড়লেও আমাকে ওরকম অনহেলা হেনেস্থা সইতে হয়নি। বড্ড আদরেই মানুষ হয়েছিলাম বোন, বাপের একটি মেয়ে – বাবাজান তো আমায় 'আম্মাজান' আম্মাজান' করে আদর-সোহাগ দিয়ে হয়রান করে ফেলতেন। সবচেয়ে তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল আমায় লেখাপড়া শেখাবার। এর জন্য কত টাকা যে খরচ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার ঘরই তো একটি জবরদস্ত লাইব্রেরি ছিল, তার ওপর আবার এক ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী রেখে আমায় নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকে, বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুরা, কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে, আমি বুঝতে পারিনে! আমার বোধ হয় ও শুধু ঈর্ষা আর নীচ-মনার দরুন। ভালো-মন্দ সব সমাজেই আছে, তাই বলে যে অন্যের বেলায় শুধু মন্দের দিকটাই দেখে ছোটোলোকের মতো টিটকিরি মারতে হবে এর কোনো মানে নেই। আমার পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী ওই ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে পড়লে এখনও একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এত মহিমান্বিতা মাতৃশ্রী- মণ্ডিতা যে ধর্মের নারী, এত অনবদ্য পূত শালীনতা ও সংযমবিশিষ্টা যে সমাজের নারী সে ধর্মকে সে সমাজকে আমি সালাম করি। আমি তাঁকে মায়ের মতোই ভক্তি করতে পেরেছিলাম, ভালোবাসতে পেরেছিলাম এমনই স্নেহ-মাধুর্যে পবিত্র স্নিগ্ধতায় ভরা ছিল তাঁর ব্যবহার! মা কত দিন এসে হেসে বলতেন, – 'দিদি, তুমি আমার রেবাকে মা ভুলিয়ে দিলে দেখচি।' তিনিও হেসে বলতেন, – 'তা বোন, আজকালকার মেয়েগুলোই নিমকহারাম, আজ তোমাকে ছেড়ে আমাকে মা বলচে, আবার দু-দিন বাদে শাশুড়ি গতরখাকিকে মা বলবে গিয়ে। আর তাছাড়া আমার সাহসিকাও তোমার নাম করতে পাগল। সে আবার আপশোশ করে যে, কেন তোমার পেটে সে জন্মায়নি। এখন এক কাজ করি এসো, আমরা মেয়ে বদল করি।' তুই বোধহয় শুনেছিস যে, ওঁর সাহসিকা বলে আমারই বয়সি একটি মেয়ে ছিল। তাতে আমাতে এত গলায়-গলায় মিল ছিল, তা যদি শুনিস তো তুই অবাক হয়ে যাবি। আমার সে শিক্ষয়িত্রী-মা আজ আর নেই, – আজ এই কথাটি মনে হতেই দেখেছিস টস টস করে আমার চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়ল! সাহসিকা বি. এ. পাস করে এখন এক স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে। প্রথম জীবনেই সে

বুকে মস্ত এক দাগা পেয়ে বিয়ে-টিয়ে করেনি, চিরকুমারী থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে এখনও মাঝে মাঝে আমায় চিঠি দেয়, সে চিঠিগুলোর এক একটা অক্ষর যেন বুক ফাটা কান্নার অশ্রুফোঁটা। তুই যদি আসিস তা হলে এবার সব চিঠিগুলো তোকে দেখাব। আঃ, সে কতদিন তাতে আমাতে দেখা নেই. তবু তার কথাটা যখনই মনে হয় তখনই যেন জানটা সাতপাক মোচড় খেয়ে ওঠে। আমার বিয়ের সময় তার কী আমোদ! তাঁরা সবাই আমার বিয়েতে এসেছিলেন। আজ আমার মাও নেই, তারও মা নেই, তাঁরা বোধ হয় বেহেশ্‌তে গিয়ে আবার একসঙ্গে মিলেছেন, তাঁদের এই অভাগি মেয়েদের জন্যে সেখানেও জান খাঁ খাঁ করে কিনা, কান্না পায় কিনা, তা কে জানে? অন্য কোনো জাতির কোনো ধর্মের কোনো সমাজের নারীর মধ্যে কই নারীত্বের এমন পূর্ণ বিকাশ তো দেখিনি। এই সমাজের যত নারী দেখেছি, সবারই ব্যবহার কথাবার্তা এত সুন্দর আর মিষ্টি যে, তাতে বনের পাখিরও ভুলে যাওয়ার কথা, এঁদের বুকে যেন স্নেহের ভরা গঙ্গা বয়ে যাচ্চে! যারা একে বাড়াবাড়ি বলে বা মানে না, উলটো নিন্দা করে, তারা বিশ্বনিন্দুক। আমার বোধহয় এঁরাই এদেশে সর্বাগ্রে সামাজিক পারিবারিক যত অহেতুক খামখেয়ালির বন্ধনকে কেটে স্বাধীন উচ্চশির নিয়ে মহিমময়ী রানির মতো দাঁড়িয়েছেন বলেই দেশের অধীনতা-পিষ্ট বন্ধন-জর্জরিত লোকের এত বুক-চড়চড়ানি। এঁদের সঙ্গে যে খুব সহজ সরল স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে মিশতে পারা যায়, এইটেই আমাকে আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বা ছুতমার্গের ব্যামো নেই, কোনো সংকীর্ণতা, ধর্মবিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায় সেই উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে। আমরা বড়ো বড়ো হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশি করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল, কিন্তু এমন দিল-জান খোলসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কী ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। আমরা তাঁদের বাড়ি গেলেই, তাঁরা হন আর না হন, আমরাই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, – এই বুঝি বা কোথায় কী ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কী! তাঁরাও আমাদের বাড়ি এসে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কী অখাদ্য

কুখাদ্য মাড়ান। এতে মানুষকে কত ছোটো হয়ে যেতে হয়, তার বুকে কত বেশি লাগে। এখনও দেশে পনেরো আনা হিন্দুর সামাজিকতা এই রকম আচার-বিচারে ভরা। যাঁরা শহরে থেকে বাইরে খুব উদারতার ভান দেখান তাঁদের পুরুষরা যাই হন, মেয়েদের মধ্যে এখনও তেমনই ভাব। ভিতরে এত অসামঞ্জস্য ঘৃণা-বিরক্তি চেপে রেখে বাইরের মুখের মিলন কি কখনও স্থায়ী হয়? এ মিথ্যা আমরা উভয়েই মনে মনে খুব বুঝি কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনে। পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এতো বড়ো ব্যবধান, গরমিল – এ কী কম দুঃখের কথা? আমাদের আত্মসম্মান আর অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আমরা আর যাই হই, কিন্তু কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে বুক বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার উদারতা আমাদের রক্তের সঙ্গে যেন মেশানো। তাই এই অবমাননার মধ্যে হঠাৎ এই ব্রাহ্মসমাজের এত প্রীতিভরা ব্যবহার যেন এক-বুক অসোয়াস্তির মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শের মতো নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। আমাদের ঘরের পাশের হিন্দু ভগিনীগণ যখন এমনি করে মিশতে পারবেন, তখন একটা নতুন যুগ আসবে দেশে। আমি জোর করে বলতে পারি, এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই হিন্দু-মুসলমানের একদিন মিল হয়ে যাবে। এইটাই সবচেয়ে মারাত্মক ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি, তাঁরা অন্য নানান দিক দিয়ে এই মিলনের চেষ্টা করতে গিয়ে শুধু পণ্ডশ্রম করে মরচেন। আদত রোগ যেখানে, সেখানটা দেখতে না পেয়ে কানা ডাক্তারের মতন এঁরা একেবারে মাথায় স্টেথিস্কোপ বসিয়ে গম্ভীরভাবে রোগ ও ওষুধ নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এই 'ছুতমার্গ' দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বের করতে আমাদের হিন্দু মা-বোনদেরই চেষ্টা করতে হবে বেশি। কেননা পুরুষদের চেয়ে এঁদেরই এ বদ-রোগটা ভয়ানক মজ্জাগত। আজকাল অনেক হিন্দু ভদ্রলোক, বিশেষ করে নব্য সম্প্রদায় (যুবক প্রৌঢ় দুই) খুব প্রাণ খুলে একসঙ্গে আমাদের পুরুষদের সঙ্গে বসে আহার করেন, আলাপ করেন, এতটুকু ছোঁয়া যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমাদের হিন্দু ভগিনীরা হাজার শিক্ষিতা হলেও অমনটি পারে না। এটা তাদের ধর্মের অঙ্গ কিনা জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ধর্মই এত অনুদার হতেই পারে না, এ নিশ্চয়ই সমাজের সৃষ্টি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে

সমাজের সংস্কার হওয়া উচিত নয় কি? – হায় কপাল! দেখেছিস কী লিখতে গিয়ে কী সব বাজে বকলাম! আমি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম, যে তোকে চিঠি লিখছি। এ কথাগুলো লিখবার সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি সাহসিকাকে চিঠি লিখচি, কারণ, তাতে আমাতে এই মতো আলোচনাই হয় বেশি। থাক যা লেখা গেল ঝোঁকের মাথায়, তাকে অনর্থক ছিঁড়ে ফেলেই বা কী হবে? ভালো লাগে তো পড়িস, নয়তো ও জায়গাটুকু বাদ দিয়েই পড়িস। এখন আমার সেই হারানো কাহিনিটা আবার 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করি।

হ্যাঁ, তারপর ঠিক সেই সময় কী সব জমিদারি ব্যাপার নিয়ে না কী জন্যে আমার শ্বশুর সাহেব মরহুম তখন বাঁকুড়াতেই সপরিবারে বাস করছিলেন। আর তোমার এই গুণধর ভাইজি বাঁকুড়ার কলেজে পড়ছিলেন। আমাদের বাসা একরকম কাছাকাছিই ছিল, কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে এঁদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়, আর তখনই আমার বিয়ের কথা ওঠে। আমাদের 'ইনি' (বর্তমানে 'খুকির বাপ') অর্থাৎ তোমার ভাইজি তখন কী জানি কেন আমাদের বাড়ি ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ওঁর নানা অসিলা করে হাজারবার আমাদের বাড়ি আসা আর একবার আড়চোখে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফস করে চারিদিকে চেয়ে-নেওয়া দেখে আমার খুব হাসিও পেত, আবার বেশ মজাও লাগত। তিনি এক-আধ দিন বিশেষ কাজে আসতে না পারলে ক্রমে আমারও মনটা যেন কেমন উড়ু উড়ু উদাসীন ভাব বোধ হত। দুষ্ট সাহসিকা তো এই নিয়ে আমায় গান শুনিয়ে টিপনি কেটে একেবারে অস্থির জ্বালাতন করে ফেলত! অবশ্য, তখনও আমাদের দেখা-শোনা হয়নি, – আমাদের বললে ভুল হবে, কেননা আমি নানা রকমে তাঁকে দেখে নিতাম, কিন্তু পুরুষদের দুর্ভাগ্যই এই যে, কোনো সুন্দর মুখ আড়াল থেকে তাকে দেখচে কিনা বেচারা ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। সাহসিকা দু-এক দিন দুষ্টুমি করে আমার ঘরে বেশ একটু জোর গলায়, যাতে উনি শুনতে পান, গান জুড়ে দিত –

সখী, প্রতি দিন হায় এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।

তখন যদি তোমার এই শান্তশিষ্ট ভাইটির ছটফটানি দেখতে! আল্লাহ! হাঁ করে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখচেন, কখনও বা গভীর মনোনিবেশ সহকারে চুপ করে বসে গম্ভীর হয়ে পড়ছেন, আবার কখনও বা কবির মতো মাথার চুলগুলো খামচে ধরে মস্ত লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন! আমরা তো দু সই-এ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়তাম! বাবা, এত বেহায়াও হয় পুরুষে? ছিঃ মা! এখন তোর ভাইজিকে সে কথা বললে, তিনি বলেন যে, গানটা বড্ড বেসুরো শুনাতো বলে তিনি ওরকম করে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন! হায় আল্লাহ! এত মিথ্যাবাদীও হয় মানুষে। আজকাল আমাদের অনেক মিয়াঁ-সাহেবরাই জোর গলায় বলচেন, অনেকে আবার লিখেও জানাচ্ছেন যে, আমাদের এ হেরেমের পাঁচিল পেরিয়ে পূর্বরাগ এ জেনানা ঘরে ঢুকতেই পারে না। হায় রে অন্ধ পুরুষের দল! এঁরা ঠিক যেন চোখে ঠুলি-পরা কলুর ঘানির বলদ। এঁরা খালি সামনেটাই দেখতে পান, আশে-পাশের খবর একদম রাখেন না। এঁদের এই দৃষ্টিহীনতা দেখে আমার মতো অনেকেই লুকিয়ে হাসে। আমি এঁদের লক্ষ করে জোর গলায় বলতে পারি, – 'ওগো কানা বলদের দল! বিয়ের আগেও হেরেমের বা অসূর্যম্পশ্যা মেয়েদের মনে পূর্বরাগের সৃষ্টি হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়!' তোমরা তো আর জোয়ান মেয়ের বা যুবক ছোকরার মন বোঝ না, সোজা খাও দাও আর উপর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তারা গোনো। তবে তোমাদের ভাগ্যি বলতে হবে যে, অনেক পোড়ারমুখিরই এই পূর্বরাগটা অধিকাংশ সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, নইলে এমনই একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হত যে, এ পুরুষরা এ কথার ঠিক উলটো বলতেন। কত অভাগির মনে যে ওই অঙ্কুর আবার মহিরূহে পরিণত হয়ে ওঠে, আবার কত জনা যে মনের বেদন মনেই চেপে তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি করে পুড়ে ছাই হয়, কে তার খবর রাখে? কে তা জানতে চায়? জানলেও কার বুকে তার বেদন বাজে? একটা কাচের বাসন ভাঙলেও লোকে 'আহা' করে, কিন্তু বুক ভাঙলে, হৃদয় ভাঙলে, জেনেও কেউ জানতে চায় না, 'আহা উহু' করা তো দূরের কথা। কিন্তু কোনো 'মুখপুড়ি' যদি কুলে কালি দিয়ে ভেসে যায়, তখন এদের আস্ফালনে গগন বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুরুষরা এত সুবিধে করে উঠতে পেরেছেন, তার কারণ মেয়েরা মুখ

থাকতে বোবা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না! – এই নে, ফের কোথায় সরে পড়েছি।
–

তারপর বোন, সত্যি বলতে কী, তোর এই সোজা মানুষ ভাইটিকে ক্রমেই আমার বেশ ভালো লাগতে লাগল। বিশেষ করে এঁর কণ্ঠ-ভরা গান আমার কানে বড্ড মিষ্টি শুনাত। পরে জেনেছি, এই ভালো লাগাটাই হচ্চে পূর্বরাগ। এখন মনে হয়, পুরোপুরি ভালোবাসার চেয়ে এই পূর্বরাগের গোলাবি রাগটারই মাদকতা আর মাধুর্য বেশি, এর পাতলা অরুণ ছোপ বুকে নিবিড় হয়ে না লাগলেও এর তখনকার রঙটা বেশ চমকদার। যদিও আমি থাকতাম অন্তঃপুরের অন্তরতম কোণে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে, তবুও ওঁর পায়ের ভাষা আমি অতি সহজেই বুঝে ফেলতাম। রোজ সন্ধ্যা হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁর গান শোনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম, – কেননা তিনি মনুকে গান শিখানোর অসিলাতেই অন্য সময় ছাড়া সন্ধেটাতে রোজ আসতেন আর শেখানোর চেয়ে নিজে গাওয়াটা বেশি পসন্দ করতেন : কেননা নিশ্চয়ই তাঁর এ আশা থাকত যে একটি তরুণ প্রাণী লুকিয়ে থেকে তার গান শুনছে। … আমার এই উন্মনা ভাবটা অন্তত মায়ের চক্ষু এড়ায়নি, এটাও আমি বুঝতে পারতাম। এইখানে আর একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক, – আমাদের পূর্বরাগটা একতরফা হয়নি অর্থাৎ শুধু আমি নয়, তোমার ভাইজিকেও নাকি ওই একই রোগটায় বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কেননা আমাদের বিয়ে হওয়ার পর এই সত্যবাদী ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, কোনো এক গোধূলি-লগ্নে সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা আমায় তিনি আমাদের মুক্ত বাতায়নে উদাস আনমনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তা ছাড়া আরও দু-একদিন – কোনো দিন বা আঁচলের প্রান্ত, কোনো দিন বা চুলের একটি গোছা, কোনো দিন বা ঈষৎ 'আবছা' চোখের চাওয়া, আবার অভাবে কোনো দিন বা চাবির রিং-এর বা রেশমি চুড়ির রিনিঝিনি – এই রকম যত সব ছোটো-খাটো পাওয়ার আনন্দেই তিনি একেবারে 'রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়ের মাঝারে' তাঁর হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিলেন! তা নাহলে তিনি এতদূর নিঃস্বার্থ পরোপকারী হয়ে ওঠেননি যে, পরের বাড়ি গিয়ে এতবার এতক্ষণ ধরে ধন্না দিয়ে আসেন। তাঁর অবস্থা নাকি আবার আমার চেয়েও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এই বিরহ-ভোগের ঠেলায়, আর

তারই প্রমাণস্বরূপ এমন ভালো ছেলে হয়েও সেবার তিনি বি.এ. ফেল করলেন। অগ্রেই সত্যিকার বিয়ে পাশ করে ফেলার দরুণেই নাকি তিনি সেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ.টা পাশ করতে পারেননি। সাহসিকাই এই কথাটা ওঁকে লিখে জানিয়েছিল, সে আরও লিখেছিল যে, আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডবল 'অনার্স' উঠে গিয়েছে কিনা, তাই 'বিয়ে' অনার্সের পর আর একটা অনার্স মঞ্জুর হল না! – এইখানে আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো! আমাদের অনেক ঘরের কথা তোকে জানিয়ে দিলাম এই জন্যে যে, তোর উপন্যাস আর গল্প পড়ার ভয়ানক সখ। আর এটা নিশ্চয় জানিস যে, গল্প-উপন্যাস সব মনগড়া কথা, তাই আমাদের এই সত্যিকার ঘটনাটা তোকে উপন্যাসের চেয়েও হয়তো বেশি আনন্দ দেবে। এতে আমার লজ্জার কিছুই নেই, আর এরকম করে বলা বা লেখাও মেয়েদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। মেয়েরা যা একটু লজ্জাশীলা থাকে বিয়ের আগেই, তারপর বিয়ে হয়ে গেলেই (তাতে যদি ছেলের মা হল, তাহলে তো কথাই নেই) তাদের সামনে দিকটার এক হাত ঘোমটা পিছন দিকে দু-হাত ঝুলে পড়ে। তাছাড়া এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন চিঠি, এ তো আর অন্য কেউ দেখতে আসছে না।...

এইবার অন্যান্য দরকারি কথা কটা বলে ফেলি। তিন দিন থেকে একটু একটু করে যতই চিঠিটা লিখছি, কথা ততই বেড়েই চলেছে দেখছি।

তুই বোধ হয় শুনেছিস যে, তোর সই সোফিয়ার বিয়ে। কিন্তু তোর চিঠিতে ওর কোনো উল্লেখ না দেখে বোঝাও তো যায় না যে তুই এ-খবর জানিস। আর জানবিই বা কী করে বোন? আমিই জানতাম না এতদিন। তোমার এই সোজা শেওড়া গাছ ভাইটি তো কম নন 'নিম্নমুখো ষষ্টি, ছেলে খান দশটি!' এ মহাশয়-লোকটির কুঠে কুঠে বুদ্ধি। তিনি তলে তলে এসব মতলব পাকিয়ে 'চুনি বিল্লু'র মতো চুপসে বসেছিলেন, অথচ ঘরের কাউকে এমনকী এ-বান্দাকেও কখনও এতটুকু ইশারায়ও জানতে দেননি। – একদিন গম্ভীরভাবে এসে বললেন কী, – "ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ, এ-বছর বি.এ. দেবে, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও জোর 'সাটিফিস্টি' পাওয়া গেছে, তার সম্বন্ধে কোনো খটকা নেই, আর যা দু-একটু দোষ-

ঘাট আছে তা তেমন নয় – নিষ্কলঙ্ক চাঁদই বা আর কোথায় পাওয়া যাবে!” ইত্যাদি। আমি তো বোন প্রথমে ভেবেই পাইনে উনি কী বলছেন। পরে মনে করলাম, হতেও পারে। পরে কত ‘নখরা্ তিল্লা’ করে বলা হল যে, আমাদের মনুয়রের সঙ্গেই সম্বন্ধ তিনি অনেকদিন থেকে মনে এঁটে রেখেছেন। আমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্যই এত দিন তা বলা হয়নি।... সে যাই হোক, এইবার কিন্তু দুই বাঁদর-বাঁদরি মিলবে ভালো। মনুটা যেমন বাঁদর বেলেল্লা, সোফিও তেমনই আফলাতুন কাহারবা মেয়ে! ঝ্যাঁটার চোটে বিষ নামিয়ে দেবে সে! বিয়ের পর ওদের যদি রোজ হাতাহাতি না হয়, তো আমার নাম আর-কিছু রাখিস! ... এইখানে আর একটা কথা, – এ-বিয়ের কথাবার্তা হওয়ার পর থেকেই সোফি যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছে! সামনা-সামনি হলে কেবল যেন একটা টেনে-আনা হাসির আভা সে তার গম্ভীর মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সেটা সকলের আগে তারই কাছে ধরা পড়ে যায়, আর সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরটাতে গিয়ে শুয়ে পড়ে! তার চোখের নিচে প্রচ্ছন্ন বেদনার একটা স্পষ্ট দাগ যেন দিন দিন কালো হয়ে ফুটে উঠচে! আমি তো হয়রান হয়ে গেছি বোন ওকে জিগগেস করে করে। সে শুধু হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দেয়, আবার দু-একবার বেশি জিগগেস করলে রাগের চোঠে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার পায়ে মাথা কুটে মরে, নয়তো নিজের চুলগুলোকে নিজে নিজেই ছিঁড়ে পাড়িপাড়ি করে ফেলে। তার চিল্লানি শুনে আর ‘তিখানি’ দেখে বোন এখন আমার তার কাছে যেতেও ভয় হয়। মা গো মা! এমন ‘ঢিট’ মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। ওর এরকম গতিক দেখে তোমার ভাইজিও যেন কেমন ক্ষুণ্ণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, অথচ যার ব্যথা তার কোথায় যে কী ব্যথা, তা আর বুঝবার কোনোই উপায় নেই। আমি নাচার হয়ে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার মতন মাঝি যার মন-দরিয়ায় কূল-কিনারা পেলে না, সে সহজ পাত্তর নয়! ওর মতলবটা কী বা কেন যে সে অমন করচে তুই কি কিছু জানিস রে? তোতে ওতে মানিক জোড়ের মতন দিন-রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস কিনা, তাই শুধোচ্চি, যদি তুই ওর মন-দরিয়ার কোনো মণি- মুক্তার খবর রাখিস। তোর মতন কাঁচা ডুবুরি যে কিছু তুলতে পারবে, তার আশা নেই; তাই দেখিস মাঝে থেকে যেন কাদা ঘেঁটে জলটাকে ঘোলা করে দিসনে। আমি যে এখন কোন্ দিক দেখি ছাই, তা আর ভেবে পাচ্ছিনে। এত ঝঞ্ঝাট, বাবাঃ! যা হোক, তুই এখানে এলে যেন একটু তবু নিশ্বাস

ফেলে বাঁচতে পারব মনে করছি। হাজার দিককার হাজার জঞ্জাল-ঝক্কির মাঝে পড়ে জানটা যেন বেরিয়ে যাওয়ার মতোই হয়েচে! শিগগির তোর ভাইজি যাবেন তোদের আনতে। এই কদিন তোদের না দেখে মনে হচ্চে যেন কত যুগ দেখিনি! দেখিস অভিমান করে আবার 'যাব না' বলে বায়না ধরিসনে যেন।

তোর জন্যে চিন্তা করিনে, তুই কেন তোর ঘাড় আসবে ; না এলে ধরে পালকিতে পুরবো, বলব এ আমাদের ঘরের বউ, এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে নূরুর সাথে! ভয় যত তোর আম্মাজানকে নিয়ে! তাঁকেও মা চিঠি দিলেন। তিনি কিছু আপত্তি করলে আমরা সবাই গিয়ে পায়ে ধরে তাঁকে নিয়ে আসব। … খুকি তো তোর আসবার কথা শুনে এই দু-দিন ধরে ঘন্টায় হাজার বার করে শুধোচ্ছে, – 'মা, লাল ফুপু কখন আসবে?' কত রকম কৈফিয়ত দিয়ে তাকে ফুসলিয়ে রাখতে হয়, নইলে সে কেঁদে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় করে ফেলে! তাকে তোর যেরকম ন্যাওতা করে ফেলেচিস, তাতে এখন তাকে যে ভুলিয়ে রাখা দায়। একটু কিছু হলেই 'লাল ফুপু গো' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদা হয়। মেয়েটা এমন নিমকহারাম, মাকে ছেড়ে তোকেই এত করে চিনলে! এখন তোর মেয়ে তুই সামলে রাখ ভাই এসে! নয়তো সাথে নিয়ে যা। এই দু মাসেই মেয়েটা যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে।…

সেখানে আর যতদিন থাকিস, একটু সংযত হয়ে থাকিস বোন। কী করবি, পরের বাড়ি দুটো মুখনাড়া সইতেই হবে।

তোর কথামতো গত মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠিয়ে দিলাম। দেখবি, আমাদের মেয়েরাও এবারে বাংলা লিখছেন, যা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।…

খালাজির পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব দিবি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী – তোর ভাবিজান
রাবেয়া

জ

সালার
১৩ই ফাল্গুন
বোন আয়েশা!

তুমি আমার হাজার 'দোয়া' জানবে। মা মাহ্‌বুবাকে আমার বুকভরা স্নেহাশিস দেবে। এখানে খোদার ফজলে সব ভালো। সোফিয়া আর বহুবিবি মা-জানের কাছে তোমাদের সব খবর জানতে পারলাম। আমায় চিঠি দেবে বলে গিয়েছিলে, তা বোধ হয় বাপের বাড়ি গিয়ে ভুলেই গিয়েছ।... আমি যেন আভাসে বুঝতে পারছি তোমাদের সেখানে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্চে। তোমার না হলেও আমার মাহ্‌বুবা মায়ের যে খুবই কষ্ট হচ্চে, এ কথা কে যেন আমার পোড়া মনে সারাক্ষণই উসকে দিচ্চে। আহা, খোদা তোমাদের সহি সালামতে রাখুন বোন! আমার মাহ্‌বুবা মায়ের আলাই-বালাই নিয়ে মরি! এই কদিন মেয়েটাকে না দেখে আমার জান যে কীরকম ছটফট করচে, তা তুমিও তো মেয়ের মা, সহজেই বুঝতে পার! মা-আমার সেই যে কাঁদতে-কাঁদতে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে বিদায় নিলে অথচ একটা কথাও বলতে পারলে না, তাই আমার দিনে-রাতে হাজার বার করে মনে হচ্চে! সোফি আর ও দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো-হাট করে রাখত, ওর যাওয়ার পর থেকে সোফিটা মন-মরা হয়ে শুধু নিজের ঘরটাতে পড়ে থাকে, আর কিছু শুধোলে আমার কোলের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদে। সে কী ডুকুরে ডুকুরে কান্না বোন ওর, দেখে চোখের পানি সামলানো দায়! মা আমার যেন দিন দিন শিকড়-কাটা লতার মতন নেতিয়ে পড়চে। কী হল ওর, ওই জানে আর ওর খোদাই জানে। হাজার শুধোলেও কোনো কিছু বলচে না। এমন চাপা মন তো ওর কোনো কালে ছিল না বোন। আমার এত ভয় হচ্চে! কাল দিন বাদে ওর বিয়ে, আর এখন থেকেই কিনা এমন হয়ে শুকিয়ে পড়চে। হায় আমি যে কী করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে! মাহ্‌বুবাটা থাকলেও বোধ হয় ও এমন হত না। যাক, খোদা যা লিখেচেন অদৃষ্টে তাই হবে, আর ভেবে কী ফল!

তার ওপর আবার তোমাদের এই কাণ্ড! তোমাদের এতটুকু কষ্টের কথা ভাবতেও যে আমি মনে কত কষ্ট পাই, তা বলতে গেলে বলবে যে মায়াকান্না কাঁদচে। কেননা এখন সেদিন আর নেই। কোথা থেকে কী একটা গোলমাল মধ্যে থেকে বেধে গিয়ে আমার না হোক তোমার যে মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই মন-ভাঙা-ভাঙির আগে কিন্তু এরই পাশাপাশি বাড়িতে থেকে আমাদের অতকাল কেটে গেল, কিন্তু কোনোদিন কোনো মনান্তর তো দূরের কথা, তেমন কোনো খুঁটিনাটিও হয়নি।... আজ যদি মাহ্‌বুবার বাপ (আল্লাহ্‌ তাকে জিন্নতে জায়গা দেন!) বেঁচে থাকত, তাহলে কী তোমরা তার বাপ-দাদার ভিটে এমন করে ছেড়ে যেতে সাহস করতে? এক দূরসম্পর্কের বোন না হয়ে তুমি যদি আমার মায়ের পেটের 'সোদর' বোন হতে, তাহলে হয়তো আমার এতদিনের এত বড়ো অধিকারকে 'পা'মাড়িয়ে যেতে পারতে না। মাহ্‌বুবার বাপ বেচারা তো চিরটা কাল আমার আপন ছোটো ভাইটির মতোই আদর আবদার নিয়ে আসত, ওতে আমার যে কত আনন্দ হত, আমার বুক যে কীরকম ভরে উঠত, তা আমিই জানি আর আল্লাহ্‌ জানেন। তুমি হয়তো বলবে যে, সে অন্য সম্পর্কে আমার্‌ ছোটো দেবরই ছিল, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে শুধু তার জন্যে নয়, তোমার জন্যেও তার ওপর আমার স্নেহমায়াটা এত বেশি করে পড়েছিল। তোমার বিয়ের কথা আমিই উঠাই তার সঙ্গে, সে সময় সে হাসতে হাসতে বলেছিল, – 'ভাবিসাহেবা, আজকাল বউ পসন্দ করে নেওয়ার একটা হুজুগ পড়েছে, কিন্তু দেখচি আমার হয়ে আপনিই সমস্ত করে দিলেন! তবে আমি এই ভরসায় রাজি হচ্চি যে, আপনার মতো ঝুনো দালালের হাতে ঠকবার কোনো ভয় নেই!' আর সে কী হাসি! আজও আমার কানে ওর অমনি কত কথা কত হাসি মনে পড়চে। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর সে আমায় সালাম করতে এসে হেসে কুটিকুটি হয়ে বলেছিল, – 'ভাবিসাহেবা, আজ থেকে কিন্তু আপনি আমার 'জেড়শাস' অর্থাৎ কিনা জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা। আর আমাদের হিন্দুদের ঘরে জ্যেষ্ঠা শ্যালিকারা ছোটো বোনের স্বামীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করলেও আমাদের সমাজে কিন্তু উলটো নিয়ম, আর সে নিয়ম অনুসারে আপনার আমার সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, দেখা-শোনাও হতে পারে না!' আজ সে নেই, তার সে হাসিও নেই! ও আর নূরুটা গিয়ে আমাদের পাড়াটা যেন দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মতো সুনসান হয়ে রয়েচে!

তারই একটি কণা স্মৃতি মরণ-কালে আমার হাতে সঁপে-দেওয়া মাহ্‌বুবা মা-জানকে যে তুমি এমন করে বেদিলের মতন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তা আমি কোনোদিনই ভাবতে পারিনি। তোমার বোধ হয় মনে আছে, ছেলেবেলায় ও তোমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার কোলে এসে আমার দুধ খেতে, আর সে সময় সোফিতে আর ওতে কীরকম খামচা-খামচি চুলোচুলি হত! তুমি যদি বা ভোল, সে ভুলবে না ; আমার বুকের রক্ত যে তার রক্তে মিশে রয়েছে!... আর তোমার কথাই বলি, – তুমি তো কোনোদিনই আমার মুখের ওপর একটি কথা কইতে সাহস করনি, – কিন্তু সেই তুমি কিনা যেই তোমার ভাই তোমায় নিতে এলেন অমনি আমাদের সবারই ঘরগুষ্টির এত কাঁদন পায়ে-পড়া অনুরোধ উপেক্ষা করে উলটো আরও পাঁচ কথা শুনিয়ে চলে গেলে! কোনোদিন তো তোমার কাছ থেকে এমন ব্যাভার পাইনি, তাই সেদিনকার কথাগুলো আমার বুকে যেন শেলের মতোই গিয়ে বেজেছে। তুমি যে এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারবে, তা জানতাম না। তাই আগে থেকে প্রস্তুতও ছিলাম না। তুমি নূরুর ব্যাভারের যে খোঁচা দিয়ে গেলে তা আমি অবশ্য স্বীকার করে নিলেও, ওতে যে আমাদের নিজের কতটা দোষ ছিল, তা নিয়ে তুমিও তো আর কিছু অ-জানা ছিলে না। আমার পেটের ছেলে না হলেও আমার রবুর চেয়েও সে বেশি, সুতরাং তার এই খ্যাপামো হঠকারিতায় কী তোমার চেয়ে আমি কম কষ্ট পেয়েছি, না, সে কি আমারও বুক ভেঙে দিয়ে যায়নি? তোমার চেয়ে যে সে আমারই অপমান করেছে বেশি। আর মাহ্‌বুবাকে কি আমি কোনোদিন সোফির চেয়ে কম করে দেখেচি? সে যে এইরকমই কিছু একটা পাগলামি করে বসবে, বিয়ের কথা আরম্ভ হতেই কী-জানি-কেন আমার মনে কেবলই ওই শঙ্কা জাগছিল। কেন না এই পাগলা ছেলে কতবার বিয়ের কথা শুনেই এক-দু মাস করে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়িয়েছে। শুধু রবুর আর বৌমার জিদের আর উৎসাহের জন্যে আমি কিছু বলে উঠতে পারিনি, পাছে তারা মনে করে যে আমার মনটা শুধু অলুক্ষুণে কথাই ভাবে। মা ছেলেকে যেমন বোঝে তেমন আর কেউ বোঝে না। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনেছিলাম যে, ও আমার বাউল উদাসীন ছেলে। তাই আমি কোনোদিনই তার বিয়ের জন্যে এতটুকু চিন্তিত হইনি বা আশাও করিনি। মনে করতাম, আহা থাক আমার ও

কোল-মুছা খ্যাপা ছেলে হয়ে! দু-দিন বাদে সোফিয়া শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। রবু সংসারী হয়ে ছেলে-মেয়েদের পেয়ে হয়তো বুড়ো মাকে আর মনে করবে না, কিন্তু চিরদিন থাকবে আমার কোল ঠান্ডা করে, এই চিরশিশু নূরু – এই ঘর-ছাড়া উদাস ছেলে আমার! হায়, মানুষ ভাবে এক, আর খোদা করেন আর এক! একটা হুজুগের মাতামাতিতেই ছেলে আমার এমন করে মালিক-উল-মউতের হাতে গিয়ে জানটা সঁপে দিল – এই রাক্ষসী লড়াইয়ে চলে গেল। আর আমি কিছু চাইনে বোন এখন, খোদার রহমে আর তোমাদের পাঁচ জনের দোয়াতে ছেলে আমার বেঁচে বাড়ি ফিরে আসুক – সে না হয় চিরটা দিন থুবড়োই থাকবে। বউমার যেমন অনাসিষ্টি ঝোঁক, কী করতে গিয়ে শেষে কী হয়ে গেল। কেন, আমার মাহ্‌বুবার মায়েরই কি বিয়ে হত না, যে এমন আকাল-হুড়োর মতন কাড়াকাড়ি? আমি বি.এ-এম.এ পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলে এনে তার বিয়ে দিতাম। তাতে যত টাকাই খরচ হোক। জমি-জায়গা টাকা-কড়ি কাদের জন্যে? ছেলে-মেয়েদের সুখী করে তাদের মুখে হাসি দেখে তা আমরা চোখ মুদি, তারপর খোদা তাদের নসিবে যা লিখেচেন হবে! তখন তো আমরা আর কবর থেকে উঠে, তা দেখতে আসবো না। কথায় বলে – 'চোখ মুদলে কেবা কার!' ... যাক, যা হয়ে গেছে, তা গিয়েছে ; নসিবের উপর চারা নাই। তা নিয়ে অনুতাপ করেও কোনো ফল হবে না। কী করি, মন বালাই – কোনো মানা মানে না, তাই দুটো কথা না বলেও পারি না! দু-একবার মনে হয়, দূর ছাই। পরের ছেলেকে আপনার করতে গিয়েও যখন আর হল না, তখন আর কেঁদেই কী হবে – মন খারাপ করেই বা কী পাব? হায় বোন, কিন্তু মন সে কথা বুঝতে চায় না! রাত্তি-দিন রোজা নামাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, আল্লার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটাতে চাচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের বিশেষ করে মাদের মনে যে খোদা কি দুর্বলতা দিয়ে দিয়েছেন যার জন্যে বেহেশ্তে গিয়েও আমাদের জান চায়েন হয় না। শুধু বাচ্চা-হারা বাঘিনীর মতো অশান্ত মন কেঁদে কোঁকিয়ে মরে! আমারই হয়েছে তাই মুশকিল। জিন্দেগির বাকি কালটা যে আল্লার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেব, তাও বুঝি তিনি কপালে লেখেননি!

যাক বোন, এখন আসল কথা হচ্ছে তোমরা ফিরে এসো। বেশ হল, বুকে এত বড়ো 'দেরেগে' শোক পাওয়ার পর দু-দিন বাপ-মায়ের বাড়িতে বেরিয়ে মন

বাহালিয়ে নিলে, এখন আবার ঘরের বউ ঘরে ফিরে এস। বাপ-মায়ের বাড়িতে বেশি দিন থাকা 'আয়েব' ও বটে, আর তাতে মান-ইজ্জতও থাকে না। এখন তোমাকে শ্বশুরকুলের আর মৃত স্বামীরই সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে। যে ঘরের বউ তুমি, সে ঘরের মাথা উঁচু রাখতে তুমি সব দিক দিয়ে বাধ্য। রবুকে পাঠিয়ে দেব পালকি নিয়ে তোমাদের আনবার জন্যে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তাহলে ঘর দেখবে কে? বউ-বেটি ছেড়ে কি আমার কোথাও যাওয়ার জো আছে! আর রাগ অভিমান করিসনে বোন। তোরা সবাই মিলে যদি আমার মনে এমন করে কষ্ট দিস তা হলে দেখছি কোনো দিন বিষ খেয়ে আমাকে হারামি মউত মরতে হয়। আর তা নইলে তো তোমাদের এই হাড়-জ্বালানো স্বভাব থামবে না। আমার মাহ্‌বুবা মাকে নিয়ে আর বেশি দিন সেখানে থাকা মস্ত বড়ো দোষের কথা। আইবুড়ো মেয়ে – হোক না মামার বাড়ি, লোকে তো দশটা কথা বলতে কসুর করবে না ; আর তা শুনে শুনে তুমিও অতিষ্ঠ, তেতো-বেরক্ত হয়ে উঠবে। তোমরা যেদিন আসতে চাও, সেই দিনই শ্রীমান রবিয়ল বাবাজীবন সেখানে পালকি নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। তোমরা এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। পত্রপাঠ উত্তর দিতে ভুলো না যেন, একথা আমি তোমার কান কামড়ে বলে দিচ্ছি।

খুকি যে তোর জন্যে "থোত দাদি দাবো – থোত দাদি দাবো' বলে মাথা খুঁড়চে এখানে! মাবুর জন্যেও কত কাঁদে। হায় রে কপাল, এমন বে-দরদ ছোটো দাদি যে একটা চিঠি দিয়েও পুতিনের খবর নেয় না! আর সেই পুতিনের আবার ছোটো দাদির জন্যে এমন মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কান্না!

হাঁ, আর একটা মস্ত বড়ো জরুরি কথা, – ছাই ভুলেও যাচ্ছিলাম। আমার কি কিছু মনের ঠিক-ঠাক আছে বোন! এখন মরণ হলেই বাঁচি!... বলছিলাম কী আমাদের সোফিয়ার বিয়ে বউমার ছোটো ভাই মনুয়রের সঙ্গেই ঠিক করেছি। রবু বোধ হয় চিঠি দিয়ে আগেই সেকথা জানিয়েছে। তুই একবার এসে সব কাজ দেখে শুনে গুছো এসে; সোফি তোরই তো মেয়ে। আর, মাহ্‌বুবা মা না এলে সোফি বোধ হয় বিয়েই করবে না। আমি বোন এ-সব ঝামেলা সইতে পারব না এ মন নিয়ে।

সেখানকার সকলকে দর্জামতো সালাম দোয়া দেবে। হাঁ, আর একবার তোর হাত ধরে বলছি বোন আমার, দেখিস নূরুকে কোনো আহা- দিল বদ-দোয়া দিসনে যেন, বাছা আমার কোথায় কোনো দেশে পড়ে রয়েচে, হয়তো এতে তার অকল্যাণ হবে। ইতি –

তোমার বড়ো বোন
রকিয়া

–––––

শাহপুর
১লা চৈত্র
বুবু সাহেবা!

তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান কারণে উত্তর দেওয়া হয়নি।

মাহ্‌বুবাটাও বোধ হয় বউমার কিংবা সোফিয়ার চিঠি পেয়েচে, তাই এই কদিন ধরে শুধু তার কাঁদো-কাঁদো ভাব দেখা যাচ্চে।

আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এমনই বেইমান! আমার মেয়ে কিনা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলতে চায়। মাহ্‌বুবা এখন আমাকে দেখলেই একপাশে সরে যায়, চোখ মুখে তার কান্না থমথম করে ওঠে! বাপরে বাপ, এ কলিকালে আরও কত দেখব বুবুজান, – দশ মাস দশদিন গর্ভে-ধরা বুকের লোহু দিয়ে মানুষ-করা একমাত্র মেয়ে সেও কিনা দুঃখিনী মায়ের বিদ্রোহী হয়? গরিবের মেয়ের – যার দিন-দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ নেই, তার আবার এত গরব কীসের! এসব দেখে আমার বোন দুঃখও হয়, হাসিও পায়!

তোমরা আমাদের খুবই উপকার করেছ বুবুজান, আমরা গরিব হলেও সে উপকার ভুলে যাওয়ার মতন বেইমানি আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে

তোমাদের পায়ের জুতো বানিয়ে দিলেও সে ধার শোধ হয় না। তবে কথা কি জানো আমরা গরিব, তাই হয়তো লোকের ভালো কথাও এসে অপমানের মতন আমাদের বুকে বাজে। আর বোধ হয়, সেই জন্যেই মনে করচি তোমরা উপকার করে মায়ামমতা দেখিয়ে আজ আবার তারই খোঁটা দিচ্ছ! বড়ো দুঃখেই লোকে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি যদি সমান দরের লোক হতাম তা হলে হয়তো খুব সহজেই তোমার ও উপকার, অত স্নেহ-মায়া অসংকোচে নিতে পারতাম ; কিন্তু আমি গরিব বলেই মনে করি, ও তোমাদের বড়ো মনের অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি আর দয়া ভিন্ন কিছুই নয়। আর, ও নিতে আমার মন তাই চিরটা দিনই লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে এতটুকু হয়ে যেত। মাহ্‌বুবার বাপ যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন আমি ও কথা তোমায় বলি-বলি করেও বলতে পারিনি, আর বলতে গেলেও উনি বলতে দিতেন না । এতে হয়তো তুমি মনে বড়ো কষ্ট পাবে বুবুজান, কিন্তু আর সত্যি কথাটা লুকিয়ে নিজের মনের দংশন-জ্বালা সইতে পারছিনে বলেই বড়ো কঠিন হয়েই এ কথাটা জানাতে হল। আমার এত আত্মসম্মান থাকাটা কিন্তু আশ্চর্য নয়, কেননা আমি গরিবের ঘরে বউ হলেও আমার বাপ মস্ত শরিফ। এইসব অপ্রিয় কথাগুলো বলে তোমাকে খুবই কষ্ট দিচ্চি বুঝি, কিন্তু কত দুঃখে যে আমার মুখ দিয়ে এসব নির্মম কথাগুলো বেরোচ্ছে তা এক আল্লাই জানেন। উনি তো বেহেশ্তে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু এ -অভাগিকে তুষের আগুনে একটু একটু করে পুড়ে মরতে রেখে গেলেন! এখন এই যে আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে বুকের ওপরে, এ তো মেয়ে নয় – আমার বুকের ওপর যেন কুলকাঠের আগুনের খাপরা। ওকে নিয়েই আমার যত ভাবনা, তা নইলে আমার আজ চিন্তা কী? উনি যে দিন চলে গেলেন, সেই দিনই এ পোড়া জানের ল্যাঠা চুকিয়ে দিতাম।

আমাদের এখানে কোনো কষ্টই নেই। ওই হতভাগি মেয়ে বোধ হয় লিখে জানিয়েছে সব দরদি বন্ধুদের, না? ও মেয়ে দেখচি দিন দিন আমারই দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্চে। হাড় কালি করে ছাড়লে হতচ্ছাড়ি পোড়ারমুখি, তবু তার আশ মিটল না। এখন আমার কলজেটা বের করে খেলেই ওর সোয়াস্তি আসে। এই ঢিবি বেয়াড়া মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। য়্যা বড়ো-মান্‌ষি চাল, যেন কোনো নবাবের মেয়ে! সত্যি বোন,

তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহি মেজাজের করে তুলেছ। এখন আমায় সর্বদাই পাহারা দিয়ে থাকতে হয় তাকে, পাছে কখন কোন্ অনাছিস্টি করে বসে থাকে বা কারুর মুখের ওপর চোপা করে একটা ঝগড়া-ঝাঁটির পত্তন করে বসে। খোদা আর কোনো দিকে সুখ দিলেন না।

ওঁর মরবার আগে আমি মুখরা ছিলাম না বলে যে তুমি আমাকে দোষ দিয়েছ বুবুজান, সে তোমার বুঝবার ভুল। আমি চিরদিনই এমনই কাঠ চোটা কথা কয়ে এসেচি, তবে তখন ছিল একদিন আর আজ একদিন। তখন আমাদের এ মন ভাঙাভাঙিও হয়নি আর তোমার ভালোবাসাটাও হয়তো সত্যিকারই ছিল, তাই আমার ও ঝাঁজানো কথা শুনেও শুনতে না। আজ যেই মনের মিথ্যা দিকটা ধরা পড়েছে, অমনি তোমারও চোখে পড়ে গিয়েছে যে মাগি চশমখোর মুখরা! এবার আরও কত শুনব।

খামোখা রবিয়ল বাবাজিকে কষ্ট করে এখানে পাঠিয়ো না বোন, আমি এখন যাব না। আইবুড়ো জোয়ান মেয়েকে যদি এমনি করে নালতে শাকের মতন হাট-বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তাহলে সবারই বদনাম। তা ছাড়া, এখন মাহ্‌বুবাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে আমার বাপ-মায়ের বা ভাইদের অপমান করা হয় না কি? তাঁরা কি এতই ছোটোলোক যে, তাঁদের ঘরের আবরু এমন করে নষ্ট হতে দেখে বসে বসে হুঁকো টানবেন? আরও একটা সত্যি কথা বলছি বুবু, রেগো না যেন। আমরা গরিব হলেও মানুষ, আমাদের মান-অপমান জ্ঞান আছে। এত অপমানের পরও আমরা কোন্ মুখে সেখানে আবার মুখ দেখাব গিয়ে? এখানে যদি কুকুর বিড়ালের মতোও অনহেলা হেনস্তা হয় তাও স্বীকার, তবু আর খোদা যেন ও সালার-মুখো না করেন। আমি দূর থেকেই সালারকে হাজার হাজার সালাম করচি বোন,। তুমি শুধু নিজের দিকটা দিয়েই ওই কুকুর-কুণ্ডলি কাণ্ডটা নিয়ে বিচার করেছ, কিন্তু এ গরিবদের বেদনাটুকু বুঝতে হয় বোন সেই সঙ্গে। কথায় বলে, – তাঁতি তাঁত বোনে, আপনার দিকে ভাঁড় টানে। তোমারও দেখচি তাই। আচ্ছা, এই যে মাহ্‌বুবার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, এটা কার দোষে, কোন্ বেদনার ঘা সামলাতে না পেরে? তা কী জানো? আমি তক্ষুনিই বলেছিলাম, দড়াতে দড়িতে

গিঁঠ খায় না, তা তোমাদের ঝোঁকে উনি সোজা মানুষ আমার কথাই কানে উঠালেন না। তার পর সত্যি সত্যিই 'তেলি, না, হাত পিছলে গেলি' করে নূরু আপনার এক দিকে পালিয়ে গেল – পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু মাঝে পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম আমরা – গরিবরা। মাহ্‌বুবার বাপ সে আঘাত সে অপমান সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে সরেই পড়লেন, মেয়েরও আমার বুক ভেঙে গেল! মা আমি, আমার কাছে তো আর মেয়ে মন লুকিয়ে চলতে পারে না। মাহ্‌বুবা যতই চেষ্টা করুক আমার আজ এটা বুঝতে বাকি নেই যে হতভাগি মরেছে। কিন্তু এও আমি বলে রাখলাম যে, আমি বেঁচে থাকতে যদি আমার এই মেয়ের ফের নূরুর সঙ্গে বিয়ে হতে দিই, তবে আমার জন্ম শাহজাদ মিয়াঁ দেননি! মাহ্‌বুবার বাবার উঁচু মন, তিনি মরণকালে তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আজও তোমাদের কাউকে ক্ষমা করতে পারিওনি আর পারবও না। এ সত্যি কথা আজ মুখ ফুটে বলে দিলাম। নূরুকে আমি বদ দোয়া করব না, সে যুদ্ধ থেকে সহি-সালামতে ফিরে আসুক আমিও প্রার্থনা করছি, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে পারব না তাই বলে। যে অপমান, যে আঘাতটা আমাদের সইতে হয়েছে তা অন্য কেউ হলে এতদিন তার হাজার গুণ বদলা নিয়ে তবে ছাড়ত!... যাক সে সব কথা, এ-ভাঙা মন আর জুড়বেও না, আমি সেখানে যেতে পারব না, 'ও মন আমার কাঁচের বাসন, ভাঙলে ও-মন আর জোড়ে না!' সালারেরও দানা-পানি আমার কপালে আর নেই বোন ; তা সেই দিনই ফুরিয়েছে যেদিন মাহ্‌বুবার বাপ মারা গিয়েছেন। আমি সব ভুলতে পারি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুটা আমি ভুলতে পারি না – শুধু এই কথাটা মনে রাখবে।

আমার ভায়েরা বীরভূম জেলার শেঙানের এক খুব বড়ো জমিদারের সঙ্গে মাহ্‌বুবার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করেছেন। তিনি এক মস্ত হোমরা-চোমরা বুনিয়াদি খান্দানের, তবে বয়েসটা চল্লিশ পেরিয়ে পড়েছে এই যা। কিন্তু তাঁর আগের তরফে বিবির এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। তারও আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারও ঘরে ছেলে মেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশি, তা হলে আর কী করব! গরিবের মেয়ের জন্য কোন্ নওয়াবজাদা বসে আছে বলো! এই মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে। মাহ্‌বুবাও মত দিয়েছে ; – এ শুনে তোমরা তো আশ্চর্য হবেই, আমি নিজেই আশ্চর্য

হয়ে গিয়েছি। ... আল্লাহ্ এত দুঃখও লিখেছিল অভাগির কপালে! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বুবু সাহেবা, বুক ফেটে যাচ্ছে!

যাক, তোমাদের দাওত করলাম, এসে এই দুঃখের বিয়ে দিয়ে যেয়ো – মায়ের আমার বিসর্জন দেখে যেয়ো বোন! যদি না আসতে পার, তবে সবাই মিলে দোয়া কোরো যেন পোড়ামুখি সুখী হয়।

মা সোফিয়ার বিয়েতে যেতে পারব তা আর মনে হয় না বুবুজান। তাহলে আমার ঘরের এ কাজ দেখবে কে? আমি আমার জান-দিল থেকে দোয়া করচি, খোদা আমার সোফি মাকে রাজরানি করুন। তার মাথার সিঁদুর হাতের পঁইচি অক্ষয় হোক! বেশ সুন্দর হবে, মনুয়রের সাথে ওকে মানাবেও মানিক-জোড়ের মতন। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না বলে ছটফট করছি।

আবার লিখছি বোন খামোখা রবু বাবাজিকে আমাদের নিতে পাঠিয়ো না, পাঠিয়ো না! অনর্থক হাল্লক হয়ে ফিরে যাবে। আমি জান থাকতে সেখানে যেতেও পারব না, আর মাহ্বুবার এ বিয়েও বন্ধ করতে পারব না।

বহুমাকে আর সোফিয়াকে আমার বুক-ভরা স্নেহ-আশিস দেবে। খুকিকে আমার চুমো দেবে, আমি বাস্তবিকই তার বে-দরদ দাদি!

আসি বুবুজান, মাথাটা ঘুরে আসছে! আবার আমার পুরোনো ভিরমি রোগটা কদিন থেকে কষ্ট দিচ্ছে! –

তোমার ভাগ্যহীনা ছোটো বোন
আয়েশা

———————-

সালার

২৭শে চৈত্র, রাত্রির
দুষ্টু সাহসিকা!

তোর সাথে এবার দেখচি সত্যিকার আড়ি দিতে হবে। বাহা রে, দুষ্টু ছুঁড়ি। আমি না হয় সংসারের ঝঞ্ঝাটে পড়ে তোকে কিছুদিন চিঠি দিতে পারিনি, তাই বলে তুইও যে গুমোট মেঘের মতো অভিমানে মুখ ভারি করে বসে থাকবি – হায় রে কপাল তা কি আর জানতাম?... আজ আমাদের সেই ছেলেবেলা, সে অভিমানে অভিমানে 'কান্না-হাসির পৌষ-ফাগুনের পালা' সেই মা-দের সোহাগ, – সব কথা মনে পড়ছে রে বোন, সব কথা আজ যেন চোখের জলে ভিজে বেরিয়ে আসতে চাইছে! দুনিয়ায় কেমন করে কার সাথে সহসা যে চেনা-শুনা হয়ে যায়, দুইটি হিয়াই কেমন করে কপোত-কপোতীর মতো সারাক্ষণ অন্তরের নিভৃততম কোণে মুখোমুখি বসে গোপন কূজনে হিয়ার গগন ভরিয়ে তোলে, তা সবচেয়ে সেই সময় চোখের জলে লেখা হয়ে দেখা দেয়, যখন তাদের এক ব্যথিত অজানা দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

দ্যাখ সই, আজ যখন আমার বড়ো কষ্ট বড়ো দুঃখ, সেই সময় একটি ব্যথা-পাওয়া সখীকে কাছে পেতে যেন আমার আশা দিকে দিকে ঘুরে মরছে। আমার বুকে যে আজ কথার ব্যথা জমে পাহাড়-পারা হয়ে উঠেচে বোন, কেননা, আমার খেলার সাথিটিও মূক হয়ে গিয়েছে। পরের বেদনায় নিজের বুক ভরে আমরা দুটি চিরপরিচিত জনও কেমন যেন পরস্পরকে হারিয়ে ফেলেছি। এই হঠাৎ-পাওয়া বেদনার বিপুলত্ব আমাদের দুজনকেই কেমন স্তম্ভিত করে ফেলেছে, যাতে করে এ নিবিড় বেদনার অতলতা আর কিছুতেই আমাদের সহজ হতে দিচ্ছে না। কী হয়েচে, সব কথা বলি শোন।

তোর পথিক-ভাই নূরুটার সব কাণ্ড-কারখানা তো জানিস। – আজ কিন্তু তোর ওপরেও আমার কম রাগটা হচ্ছে না রে 'সাহসী'! তুই তাকে রাতদিন 'পাগল-ভাই আমার' 'পথিক-ভাই আমার' বলে বলে যেন আরও খেপিয়ে তুলেছিলি, দোলা দিয়ে দিয়ে তার জীবন-স্রোতকে আর চল-চঞ্চল করে তাতে হিন্দোলের উদ্দাম

দোল এনে দিয়েছিলি। আমি তার বেদনায় এতটুকু নাড়াছোঁয়া না দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করবার মতলব আঁটছি, এমন সময় তুই তোর বুক-ভরা বেদনা-ঝঞ্ঝা এনে তার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দুরন্ত কল্লোল জাগিয়ে গেলি। সেই ঝঞ্ঝার ঝাঁকানি আর ঢেউ-এর হিন্দোল উচ্ছ্বাসই তাকে ঘর-ছাড়া ডাক ডেকে শেষে আগুনের মাঝে গলা জড়াজড়ি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই চির-বঞ্চিতের জীবন-যাত্রা, বড়ো দুর্বিষহ রে বোন, বড়ো দুর্বিষহ! এই বিড়ম্বিত হতভাগ্যেরা যেমন রাক্ষসের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু, তেমনই অস্বাভাবিক অভিমানী।

এই খ্যাপার শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটচে, স্পর্শালুতাও তেমনই তীব্র তীক্ষ্নতা নিয়ে ওত পেতে রয়েছে। সকল দুঃখ-বেদনা-আঘাতকে হাসি-মুখে সহ্য করবার বিপুল শক্তি এদের আছে, এদের নাই শুধু স্নেহ সহ্য করবার ক্ষমতা। স্নেহ-সোহাগের একটু ছোঁয়ার আবছায়াতেই এদের অভিমান-মথিত বুকে বিরাট ক্রন্দন জাগে। এইখানেই এরা সাধারণ মানুষের চেয়েও দুর্বল।

নূরুর ব্যথার সরসীতে যেই শৈবালের সর পড়ে আসছিল, অমনি তুই এসে একেবারে তার বেদন-ঘায়ে পরশ বুলিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত করে তুললি। তার ঘুম-পাড়ানো চিতাকে সজাগ করে দিলি। নিজে তো গৃহবাসিনী হলিনে সাথে সাথে আর এক মুগ্ধ হরিণকে তার মনের কথা মনে করিয়ে দিলি।... তোর ও দুরন্তপনা দেখে দেখে তাই আমার ভয় পাচ্ছে, পাছে তুইও না মাথায় পাগড়ি বেঁধে যুদ্ধে চলে যাস। যেমন দুষ্ট সরস্বতী মেয়ে, তেমনই নামও হয়েছে – সাহসিকা।

কিন্তু বিয়ের বেলায় তো সাহস হয় না লো! ইস! গা-টা হেলফেলিয়ে উঠচে, – না?

হাঁ, কী হয়েছে শোন।

নূরুর সাথে মাহ্‌বুবার সেই বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্তের পর তো নূরুটা যুদ্ধে চলে গেল – বনের চিড়িয়া বনে উড়ে গেল , কিন্তু তার শূন্য পিঞ্জরটি বুকে নিয়ে একটি বালিকা নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল। এ হতভাগি আর কেউ নয় বোন, এ হচ্ছে তোর বাচ্চা-সই মাহ্‌বুবা।

মাহ্‌বুবার বাবাজান হঠাৎ মারা পড়লেন দেখে তার মামারা এসে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, অনেক কাঁদা-কাটি করে পায়ে ধরেও রাখতে পারলাম না। মাহ্‌বুবার মাজান যে এমন বে-রহম তা আগে জানতাম না ভাই।

এই রাক্ষুসি মায়ের পরের কাণ্ডটা শোন। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে মাহ্‌বুবাকে ধরে-বেঁধে এক চল্লিশ বছরের বুড়ো জমিদারের সাথে তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে আমরা সকলে সেখানে গিয়ে কেঁদে পড়ি, তাঁর পায়ে আমরা ঘর-গুষ্টি মিলে মাথা কুটে-কুটেও তাঁর মত ফেরাতে পারিনি। জোর করে বিয়ে থামাতে গিয়েছিলাম কিন্তু তাতেও কোনো কিছু হয়নি! মারামারি করতে গিয়ে তোর সয়া হাতে খুব জখম হয়েছেন। তবে একেবারে ঘায়েল নয়। ঘায়েল হয়েছে ওই মন্দভাগি মাহ্‌বুবাটা। সে এখন শ্বশুরবাড়িতে – শেঙানে। আহ্ – আহ্, বিয়ের দিনে সে কী ডুকরে ডুকরে তার কান্না রে 'সাহসি', তা দেখে পাষাণও ফেটে যায়! তবু ওই বে-দিল-মায়ের জানে একটু রহম হল না। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আবার কান্না কত!... এই গোলমালে সোফির আর মনুর চার হাত এক হতে দেরি হয়ে গেল।

এ বিয়েতে তোকে আমরা ধরে আনব গিয়ে। আসতেই হবে কিন্তু। কোনো মানা শুনছিনে, বুঝলেন শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া!

তোর পথিক-ভাই পাগলা নূরুটাও আসতে পারে এই বিয়েতে। তুই এলে এবার বনবে ভালো। জানিনে হতভাগা এ-আঘাত সইতে পারবে কিনা!... আচ্ছা হয়েছে – খুব হয়েছে, যেমন অনহেলা, তেমনই মজা! এখন মতির মালা বানরে নিয়ে গেল। কথায় বলে, – 'কপালে নেই ঘি, ঠক-ঠকালে হবে কী?'

নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠচে দেখছি, আবার এ-খবর শুনলে তো সে বিধাতা পুরুষের হপ্তা-পুরুষ উদ্ধার করবে। আমাদের বুক কাঁপে রে ভাই ভয়ে দুরু দুরু করে পাছে কোনো অমঙ্গল হয়। তার চিঠির যদি ঝাঁজ দেখতিস। উঃ, যেন একটা বিপুল ঘূর্ণিবায়ু হু-হু-হু-হু করে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার

করে তুলতে চাইছে। ... আমি তার চিঠির এক বর্ণও বুঝে উঠতে পারিনে বোন, এক বর্ণও না। শুধু বুঝি, একটা তিক্ত কান্নার তীব্রতা যেন তাকে ক্রমেই শুষ্ক তীক্ষ্ণ করে ফেলচে।... খোদা ওকে শান্তি দিন।

চারিদিককার এই গোলমালে আমার মনে শান্তি একেবারে উবে গিয়েছে। আমার এই সাজানো ঘর যেন আজ আমাকেই মুখ ভ্যাংচাচ্চে।

মা আর সোফিও আলাদা জীব হয়ে উঠেছেন আজকাল। মায়ের দুঃখ অনেক, কিন্তু এই কচি মেয়ে সোফিটা – ? তুই এলে তবে একবার ওর গুমোর ভাঙে। মাগো মা, রাত-দিন মুখ যেন ভার হয়েই আছে। ছুঁতে গেলেই নাকে-কান্না। এমন ছিঁচকাঁদুনে ছুঁড়ি তো আমি আর জন্মে দেখিনি, যেন রাংতার টেকো আর কী!

আর লজ্জার কথা শুনেছিস রে 'সাহসি'? আজকাল সে তোর ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠেছে। এখন কথায় কথায় তোর নজির দেওয়া হয় – 'সাহসিদিই তো ভালো কাজ করেছেন – বিয়ে করা একবারে বিশ্রী কাজ, আমিও চিরকুমারী থাকব' ইত্যাদি ইত্যাদি! আমার তো চক্ষুস্থির! ওরে বাপরে, – এখন তুই এসে একে তোর কাছে নিয়ে গিয়ে এক-আধটা শিক্ষয়িত্রীর পদ-টদ খালি থাকে তো দিয়ে দে! বেশ চেলা জোটাচ্ছিস কিন্তু ভাই। আমি বলি কী, তোরা যত সব চিরকুমারী আর চিরকুমারের দল মিলে একটা নেড়া-নেড়ির দল বের কর। কেমন লো, – কী বলিস?

তোর বর না হয় তোর রূপ-গুণের জৌলুস দেখে ভয়েই পিঠটান দিল, কিন্তু আমাদের এই শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের ঝগড়া-করা আর নাকে-কাঁদা ছাড়া অন্য কী গুণ আছে, যাতে করে তাঁর 'অচিন-প্রিয়তম' তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন? কিন্তু এইখানে কথা হচ্চে যে, এই ঝগড়াটে ছুড়ির আবার 'প্রিয়তম'ই বা কে? সে কি কোনো পরিস্থানের শাহজাদা উজিরজাদাকে খোয়াবে-টোয়াবে দেখেছে নাকি? এসব কথা তুই-ই এসে জিজ্ঞেস করবি ভাই, আমি বলতে গেলে এখন আমায় সে

লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে। জানি না, ওঁর 'পীতম' কোন্ গোকুলে বাড়ছে। কিন্তু দেখিস ভাই, এসে ওকে যেন আবার চেলা বানিয়ে নিসনে।

আর, তুই নিজে কি এমনই সন্ন্যাসিনীই রইবি? হায় রে শ্বেতবসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল! চোরের সঙ্গে ঝগড়া করে ভুঁই-এ ভাত খাবি নাকি? আয় তো এখানে একবার, তারপর মনে করেছি কী, তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব! কী বলিস, বিবি হতে পারবি তো? তবে আজ এখন আসি। ইতি-

তোর ভুলে-যাওয়া সই
রাবেয়া

––––-

বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা
প্রথম বৈশাখ (সকাল)
ভাই রেবা!

আজ যে নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম সকালে তোর নামটিই সর্বপ্রথমে আমার মনের কোণে উঁকি মারল, আমার এ বিপুল আনন্দের নিবিড় মাধুরী তুই হয়তো বুঝবিনে ; কেননা, তুই এখন ঘরের লক্ষ্মী, তোর ভালোবাসা পাওয়ার আর দেওয়ার অনেক লোক আছে, কিন্তু আমাদের তো আর পোড়াকপালে সেসব কিছু জুটল না। আমার বন্ধু আছেন অনেক, কিন্তু সেসব মামুলি ; তাঁদের সঙ্গে শুধু লৌকিকতার খাতিরটুকু মাত্র, প্রাণের সঙ্গে কারুর কোথাও এতটুকু মিল নেই। তোকে যেমন অসংকোচে একেবারে সেই ছেলেবেলাটির মতন সহজ হয়ে আমার অন্তরের বাইরের সবকিছু জানাতে পারব, এমনটি তো আর কাউকে পারব না ভাই! আমার ভেতরটা এই নীরস সামাজিকতার আর লোক-দেখানো প্রীতির চাপে যখন ক্রমেই শুকনো কাঠ হয়ে উঠছিল, তখন তোর এই হঠাৎ-পাওয়া ছোট্ট চিঠিখানি যে কত অন্তরতম বন্ধুর মতন সেই শুকনো হিয়ায় পরশ বুলিয়ে তাকে

আবার ফুলের ফসলে ভরিয়ে তুললে, তা আমার এই ভাবাবেগময়ী লিপি-দূতীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারবি।

এতদিন তোর ‘সাহসি’ সই ‘পুয়াল-চাপা’ ছিল, তার কাঠামোটা নিয়ে যিনি এতদিন এই কলকাতা শহরের মহিলাদের পর্দাপার্কে, মাঝে মাঝে রাস্তায়, বোর্ডিং-এ স্কুলে গম্ভীরা হয়ে বেড়িয়ে বেড়াতেন, তিনি হচ্চেন মিস সাহসিকা বোস! বুঝলি? শুধু কী তাই! এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হোমরা-চোমরা গ্রাজুয়েট, তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদূষী, কলা-সরস্বতী! আমার আরও অনেকগুলো বিশেষণ আছে, সেগুলো আর চিঠিতে লিখে জানাচ্চিনে, তোকে একবার আমার এই কুঞ্জ-কুটিরে এনে হাতে-কলমেই দেখানো যাবে! তুই এতক্ষণ বোধ হয় তোর দুষ্টু হাড়-জ্বালানো ননদিনি সোফিকে ডেকে এনে খুব কুটি-কুটি হয়ে হাসচিস, নয়? সত্যি বলচি ভাই রেবা, এ আর আমি কী বললাম, আমার সব মহিলা বন্ধুরা আমাকে কোনো নতুন-দেখা সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এইরকম যে কত পাঁয়তারা কসরত করে যে অহম সুর-সুন্দরীর গুণ-ব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন, তা শুনে শুনে আমারও অনেক সময় মনে হয়, – নাঃ, আমি আর এখন কেউকেটা নই! যেই ভাবা, আর যায় কোথা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাবৃট-মেঘের মতন গুরু-গম্ভীর হয়ে পড়া! প্রথম প্রথম দিন কতক একটু অসোয়াস্তি বোধ হত, কিন্তু এখন দিব্যি সয়ে গিয়েছে ; শুধু সয়ে গিয়েছে বললে ভুল হবে, এখন বরং কোনো জায়গায় ওইরকম বিশেষণ-বিশেষিত অভ্যর্থনা না পেলে মনে একটু রীতিমতোই লাগে! দেখেছিস এইসব মিথ্যা বাজে জিনিসের ওপরও আমাদের মায়া কত বেশি!

আজ যে আমি তবে হালকা বা খেলো হয়ে পড়েছি তোর কাছে, তার কারণ, আমি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যে দিকে যতই বাড়ি, তোর কাছে ওই বাঁদরি ছুড়ি, লো, টে, খুব জোর ‘সাহসি’র বেশি বিশেষণে তো আর জীবনে কখনও বিশেষিত হলামও না, আর ভবিষ্যতে যে হবও না তার প্রমাণ তোর এই এতদিন পরের চিঠিটা! তাই আমার অতগুলো মর্দানি লেবাস সত্ত্বেও এবং এক মস্ত ধিঙ্গি আইবুড়ো মাগি হয়েও আজ শুধু মনে হচ্চে আমাদের সেই বাঁকুড়ার ছেলেবেলাকার কথাটা! এখন আর আমাতে

আমি নেই, এখন বাঁকুড়ার চুলবুলে সাহসী ছুঁড়ি এসে আমার মনের আসনে জোর জড় গেড়ে বসেচে! এখন আমার কী মনে হচ্চে বুঝলি লো 'খুকির-মা'? এখন বড্ড সাধ যাচ্ছে যে, সেই আমাদের কিশোরী জীবনের মতন দুই সই-এ পা ছড়িয়ে চুল এলিয়ে পাশাপাশি বসি আর খামচা-খামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব পেট ভরে মা-দের গাল খাই! নয়তো তোর ওই এক বোঝা চুল নিয়ে বেণি গাঁথতে তেমনি মশগুল হয়ে যত সব রাজ্যের ছিষ্টি-ছাড়া গপপো করি। এখন আমি এই চিঠি লিখচি তোকে আর আপনাতে আপনিই বিভোর হয়ে গিয়েছি! আঃ, কেমন করে মানুষের কত পরিবর্তন হয় বোন। আমার এত আনন্দের বাজার কে ভাঙলে, আর কেমন করেই বা ভাঙল তাই ভাবতে গিয়ে অনেক দিন পরে আমার চোখের পাতা ভিজে এল!

দ্যাখ, ভাই রেবা, নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়, এ কথাটা আজ আমি খুবই বুঝতে পাচ্চি। তার কারণ বলচি তোকে, শোন।... নানান দিক থেকে নানা রকমের ঘা আর আঘাত খেয়ে খেয়ে যখন আমার ভিতরে নারীর মাধুরী, সমস্ত পেলবতা – নমনীয়তা ক্রমেই হিম জমাট হয়ে আসতে লাগল, তার রাত-দিন মর্দানি কায়দা-কানুনের চাপে চাপে অন্তরের নারী আমার অহল্যার মতোই পাষাণ হয়ে গেল, তখন আমি সব বুঝতে পারলাম মাত্র, কিন্তু না পারলাম কাঁদতে, না পারলাম তেমন কিছু বেদনা অনুভব করতে! হায় রে বোন, তখন যে আমি পাষাণী! আমার কি আর তখন কোনো কোমল অনুভূতি জমে পাথর হতে বাকি আছে, যে তার সাড়া পেয়ে বাকি অনুভূতিগুলো একটু নড়া-চড়া করেও উঠবে! ওই পাষাণ-বুক নিয়ে শুধু শুকনো অশ্রুহীন কাঁদন কেঁদেচি যে, হায়, আমার আর মুক্তি নেই – মুক্তি নেই! অহল্যারও মুক্তি হয়েছিল, আমার মুক্তি নেই – নেই। আমার মনে হল, ওই অহল্যা নারী যখন পাষাণ হয়েছিল, তখন তার মাঝে যে আমিও ছিলাম! আজ আবার এই আমার মাঝে সেই অহল্যা তার পাষাণী মূর্তি নিয়ে এসেচে, কিন্তু এবার যেন মুক্তিটাকে বাদ দিয়ে। এই আমির মাঝে আমার সেই বহুযুগ আগের আমি তো নেই, তার যে মৃত্যু হয়েচে!... এত দুঃখ আমার বোন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারিনি! জীবনের যত দুর্ঘটনা যত রকম সম্ভব করুণ করে মনে করে কাঁদতে চেষ্টা করেচি ; মার, বাবার ফটোগুলি, তাঁদের হাতের লেখা ইত্যাদি

সামনে ধরে, আমার জীবন-ভরা হারানো প্রিয় মুখগুলি মনে করে করে যতই কাঁদতে গিয়েছি, ততই খালি কাপাস-হিম-হাসি ঠোঁটের কোণে এক রেখা ম্লানিমার মতো মাত্র ফুটে উঠেচে! ভাব দেখি একবার এই দুর্বিষহ যাতনার বিড়ম্বনা! নারী, বিশ্বের সব কিছু কোমলতা আর মাধুর্য-সুষমা দিয়ে গড়া নারী, হাজার করেও তার বুকে কান্না জাগে না, বেদনাও আঘাত দিতে পারে না! এর যাতনা আর ছটফটানি বুঝিয়ে বলবার নয় রে বোন, এ – কষ্টে যার হৃদয় কখনও এমনি শুকিয়ে ঠনঠনে পাথর হয়ে গিয়েছে সেই বুঝবে!... বৈশাখের কান্না দেখেছিস? তার ওই হু-হু-হু-হু রোদ্দুরে, ধু-ধু-ধু-ধু গোবি-সাহারায় ধুলো-বালি, শন-শন-শন-শন শুকনো ঝড়-ঝঞ্ঝা, পাহাড়-ফাটা শুষ্কতার বিপুল চড়চড়ানি, দীর্ণ-বিদীর্ণ রুক্ষ খোঁচা খোঁচা উলঙ্গ মূর্তির রুদ্র বীভৎসতা আর খাঁ খাঁ নগ্নতার হাহাকার ক্রন্দন শুনেচিস? তার ওই কঠোর কাঠচোটা অট্টহাসির খনখনে কাংস্য আওয়াজের মাঝে সারা বিশ্বের বিধবার অশ্রুহারা সকরুণ কান্নার নীরব ধ্বনি শুনেচিস? এ-বিষাক্ত তিক্ত কাঁদন বুঝিয়ে বলবার নয় রে বোন, এর লক্ষ ভাগের এক ভাগও বাইরে প্রকাশ করে দেখানোর ক্ষমতা আমার নেই! এ শাস্তি যেন অতি বড়ো দুশমনেরও না হয়! এই তো সবচেয়ে বড়ো নরক-যন্ত্রণা! এই তোদের ‘বাবিয়া দোজখ’। এতে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এই কূট হলাহল-যন্ত্রণা তাকে নিশিদিন জবাই-করা অসহায় প্রাণীর মতন ছট-ফটিয়ে কাতরিয়ে কাতরিয়ে মারে! শিব নাকি সমুদ্র-মন্থনের সমস্ত বিষ পান করে নীলকণ্ঠ নাম নিয়েছেন, কিন্তু তিনি যত বড়ো দেবতাই হন, তাঁর শক্তি যত বেশি অনির্বচনীয় হোক, আমি জোর করে বলতে পারি যে, এই অশ্রুহীন কান্নার তিক্ত বিষ এক ফোঁটা গলাধঃকরণ করলেই তাঁর কণ্ঠ ফেটে খান খান হয়ে যেত! তবে আমরা যে এখনও বেঁচে আছি? হায় রে বোন! আমরা যে মানুষ – রক্ত মাংসের মানুষ! আমাদের শরীরে যা সয়, তা যদি দেবতাদের শরীরেও সইত, তবে তাঁরা এতদিন দেবতা না থেকে মানুষ হয়ে জন্মে মুক্তিলাভ করতেন! কেননা দেবতাদের চেয়ে মানুষ ঢের ঢের, অনেক – অনেক উঁচু! তাঁদের যে একটা অমানুষিক শক্তিই রয়েচে সমস্ত সহ্য করবার। কিন্তু মানুষের এই ক্ষুদ্র বুকের ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যগুণ ক্ষমতা যতটুকু তার চেয়ে অনেক বিপুল বহু বিরাট দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা আঘাত-ঘা যে সহ্য করতে হয়! এত কষ্টেও কিন্তু সে সহজে মরে না। মরণ এ-দুঃখীদের প্রতি বাম! তার রথ এসব আর্তদের পথ দিয়ে যাওয়া তো দূরের

কথা, এ বিড়ম্বিত হতভাগাদের কর্ণে তার দূরাগত চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না! বৃথাই সে হাঁক-ডাক মারে, – 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান। কিন্তু শ্যাম ততক্ষণে অন্ধকার পথ দিয়ে মরণ-ভীতুদের কানে গিয়ে তাঁর মৃত্যু-বাঁশির বেলাশেষের তান শুনান!...

হাঁ, কীজন্য তোকে এত কথা জানিয়ে বা বাজে বকে বিরক্ত করলাম তা পরে জানাচ্ছি। এখন, কী কথা থেকে এতসব প্রাণের কথা এসে পড়ল? ... আমি বলছিলাম যে, নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়। সত্যি-সত্যিই বোধ হয় অহল্যা নারী চিরকাল পাষাণী থাকতে পারে না! নারীই যদি পাষাণী হয়ে যায়, তবে যে বিশ্ব-সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিই উবে যায়, আর বিশ্বও তখন কল্যাণ-হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতোই এক নিমিষে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়! এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ! এ-'নারী' হিম হয়ে গেলে বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দনও এক মুহূর্তে থেমে যাবে!... আমি যখন নিজেকে নারীত্ব-বিবর্জিতা এক পাষাণী প্রতিমা মনে করে অমনি অশ্রুবিহীন মৌন ক্রন্দনে আমার মর্মর পাষাণ মর্ম-কন্দরের আকাশ-বাতাস নিয়ত বিষাক্ত তিক্ত আর অতিষ্ঠ ভারি করে তুলেছিলাম, তখন তোর ওই চিঠির লেখার গোটা কয়েক মাত্র আঁচড় কী করে বুকের এক দিককার এত ভারি পাষাণ তুলে ফেলে অশ্রুর একটি ক্ষীণ ঝরনাধারা বইয়ে দিলে? কী করে আজ আমার অনেক দিনের বাঞ্ছিত কান্না তার মধুর গুঞ্জনে আমার মূক মন-সারীর মুখে বাক ফুটালে? তাই ভাবচি আর বড়ো প্রাণ ভরেই এই কান্নার মৃদুল মধুর বুদ্‌বুদ্‌-ভাষা প্রিয়তমের বাঁশির পাতলা গিটকিরির মতোই আবেশ-বিহ্বল প্রাণে শুনচি! তোর চিঠিটা এতদিন পরে এমনি না-চাওয়ার পথ দিয়ে হঠাৎ আমার পাষাণ-দেউলের খিড়কিতে এসে আচমকা ঘা না দিলে তা এত সহজে খুলত না, তা আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি। এ যেন দোর-বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রিয়জনের মুখে ডাকনাম ধরে আহ্বান শুনে চমকে দোর খুলে দিয়ে পুলক-লাজে অপ্রতিভ হওয়া! কিন্তু এখন আবার ভয় হচ্চে বোন যে, এ-দোর অভিমানে আবার বন্ধ হতেও তো দেরি না হতে পারে। অনেক কালের পরে ফিরিয়ে-পাওয়া প্রিয়জনকে দেখে বুকে হরষণ যেমনই জাগে, তার পিছু পিছু অভিমান-ক্রন্দনও তেমনই জলভরা চোখ নিয়ে এসে সে দাঁড়ায়! তাই বলি কী,

তুই এমনি অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে এমনি করে আচমকা কুক দিয়ে দিয়ে আমার মর্মর-মন্দিরের পাষাণ অর্গল খুলে ফেলিস! এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে যদি তুই রোজ এসে এমনি করে দেখা দিস তাহলে হয়তো আবার আমার মনের খিড়কি বন্ধ হয়ে যাবে। কী বলিস ভাই? লক্ষ্মীটি, এতে যেন অভিমানে তোর পাতলা অধর ফুলে না ওঠে! তোর সেই হারিয়ে-যাওয়া 'সাহসি' সইটিকে আগে এই গম্ভীরা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার মাঝে জাগিয়ে তোল, তাহলে আবার নয়তো শিং ভেঙে বকনা হওয়া যাবে!উপমাটা নেহাত ওঁচা হয়ে পড়ল, না লো? সে যেই হোক, তোমার সেই চির-কিশোরী সাহসিটা যে মরেছে, একদম মরেছে লো! তাকে বাঁচতে হলে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় রস আনতে হবে! বুঝলি? পারবি তো? দেখিস বেহায়া ছুঁড়ি, তুই যেন এই অবসরে আমার জন্যে বরাদ্দ করা চোখে চালসে-লাগা বুড়ো-হাবড়া বলদ বরের দোহাই পাড়িস নে! হাঁ, লো! আমার এখনও বিয়েই হল না, আর এরই মধ্যে নিকের জন্যে কোনো হাবড়া-বুড়োকে মোতায়েন করলি? তা ভাই, তোর যদি কোনো নানাজি বা দাদাজি থাকেন তা হলে খবর দিস, এক দিন বর পসন্দ করতে নাহয় যাওয়া যাবে। তাঁকে এখন থেকে চুলে কলপ দাড়িতে খেজাব আর চোখে সুরমা লাগানো অভ্যেস করতে বলবি কিন্তু! কন্যা-পক্ষের কিন্তু একটা কথা ভাই, দেখিস, সে নানা-বরের যেন ওই সেই বাঁকুড়ার শুকলাল বুড়োর মতো (মনে আছে তাকে?) য়্যা এক-কুলো দাড়ি না থাকে! মা গো মা! সে যে আমার মাথার চুলের চেয়েও বড়ো রে! বুড়ো চলেছে তো চলেছে, যেন রাজসভার বন্দিনী চামর ঢুলোতে ঢুলোতে চলেছে! এত যে বলছি তার কারণ দাড়ির ওই জটিল জটিলতার মধ্যে হাত-মুখ জড়িয়ে গেলে একেবারে জবর-জং আর কী, নড়ন-চড়ন নাস্তি।

দাঁড়া, আগে আমার নিজের রামপটের আরও একটু না বললে আর মনের উতপুতোনি মিটচে না। এইটে বলে বাকি দরকারি কথা কটা সেরে ফেলতে হবে। কেননা, এরই মধ্যে প্রায় নটা বেজে গেল। যদিও আমি গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি, কিন্তু আমার এই প্রিয়জনদের চিঠি লেখবার সময় আর কিছুতেই সব কথা বেশ গোছালো করে লিখতে পারিনে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু তা যেন অন্তত আমার কাছে ভাই বেশ মিষ্টি লাগে। এতে কেরদানি করে লেখবার চেয়ে যে

আসল প্রাণটুকুর – সত্যের সত্য-মিথ্যা ধরা পড়ে যায়! এই জন্যে খুব বেশি ভাবাবেগ থাকা আমার বিবেচনায় খারাপের চেয়ে ভালোই বেশি। তাছাড়া, এতে লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার (যেমন তোদের নূরুল হুদা বাঁধন-হারা) মতন একটা বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ বেশ গাঢ় করে উপভোগ করা যায়। এ আনন্দ কিন্তু বন্ধন-দশাপ্রাপ্ত বেচারিদের কাছে একটা অনাসৃষ্টি চক্ষুশূলের মতোই বাজবে। আহা, এ-বেচারাদের প্রাণে যে আনন্দই নেই, তা তারা আনন্দের মুক্তির মাধুর্য বুঝবে কী করে? একটু সাংসারিক সামান্য মামুলি সুখের মায়াতেই এরা মনে ভাবে, কেন এই তো আনন্দ! সেই দাড়িওয়ালা রাজার দাড়িতে তেঁতুল-গুড় লাগিয়ে সেই দাড়ি চুষে আম খাওয়ার স্বাদ বোঝা আর কী!… যাক সে সব কথা, আমরা তো আর জোর করে মরা লোককে বাঁচাতে পারব না! যার প্রাণে আনন্দই নেই তাকে বুঝাব কী – দু চুলোর ছাই আর পাঁশ?

দেখলি? কী বলতে গিয়ে ছাই ভুলেই গেলাম! যাক গে!…

আমার পরম স্নেহের পাগল পথিক-ভাই নূরুকে নিয়ে যখন আমায় খোঁচাই দিয়েছিস রেবা, তখন তার দিক হয়ে আমায় রীতিমতো ওকালতি বাক্‌যুদ্ধ (দরকার হলে মল্লযুদ্ধও অসম্ভব নয়!) করতে হবে দেখচি তোর সাথে। কেননা, আমিই এখন এ স্নেহ-হারার বড়ো বোন, আর সে হিসাবে তুই আমার ভাই-এর ভাবি অর্থাৎ কি-না আমার ভাজ! অতএব আমি তোর ননদিনি! তবে আয় একবার ননদ-ভাজে বেশ করে একটা কাজিয়া-কোঁদল পাকানো যাক, একেবারে কাহারবা বাজার মতো জোর! আমি এই আমার আঁচলপ্রান্ত কোমরে জড়ালাম! তুইও তবে তোর মালসা-খ্যাংরা নিয়ে বস।

সর্বপ্রথম পাগল নূরুর-কাণ্ড-কারখানা নিয়ে তোর এত রাগ হওয়া ভয়ানক অন্যায়। যে বাঁধন নেবে না, তাকে জোর করে বাঁধতে গিয়েছিলি, সে কখনও সম্ভব হয় রে বোন? পাগলা হাতি আর উদমো ষাঁড়কে জিঞ্জির বা দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলে হয় তারা বাঁধন ছিঁড়বে, নয় আছাড় খেয়ে খেয়ে মরে বন্ধনমুক্ত হবেই হবে। আর যদিই ব্যতিক্রম স্বরূপ বেঁচে যায়, তবে সে বাঁচা নয়, সে হচ্ছে জীয়ন্তে-মরা! মুক্ত

আকাশের পাখিকে সোনার শিকল, মণি-মাণিক্যের দাঁড়, দুধ-ছোলা দেখিয়ে হয়তো প্রলুব্ধ করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ বেঁধে রাখতে তো পারবে না। সেও অমনি করে বন্ধনমুক্ত হবেই! যার রক্তে-রক্তে বাঁধন-হারার ব্যাকুল ছায়ানটের নৃত্য-চপলতা নাচচে, শিরায়-শিরায় পূর্ণ তেজে নট-নারায়ণ রাগের ছন্দ-মাতন হিন্দোল-দোল দিচ্ছে, তাকে থামাতে যাওয়া মানেই হচ্চে, তার ওই নৃত্য-চপলতা আর হিন্দোল দোলে আরও আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া, আরও বিপুল দোল-উন্মাদনা দুলিয়ে দেওয়া! তুই ওকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করতিস? হাসি পায় তোর ছেলে-মানুষি কথা শুনে! আগ্নেয় পর্বত দু-চার দিন শান্ত থাকলেও তার বুকের আগুন-দরিয়া যাবে কোথায়? আমরা বাইরে থেকে তাকে শান্ত ভেবে খুব চাল চালতে পারি তার ওপরে,কিন্তু এটা যে আমরা ভুলে যাই যে, তার বুকের অগ্নি-সিন্ধুতে অনবরত ঊর্মি-লীলার তাণ্ডব-নাচ চলেছে ; ওই তুঙ্গ তরঙ্গ-গতির সমস্ত শক্তি জমে জমে এক এক বার যখন হু-হু করে আগুনের প্রতাপ-ফোয়ারা ছোটে, তখন আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবি, - ইস্ হল কী!... নয়? আমি তো তোকে হাজার বার মানা করেছিলাম যে, মিছে বোন এ খ্যাপাকে গারদে পুরবার চেষ্টা, এ হচ্ছে বিশ্ব-মাঠে ছেড়ে-দেওয়া চিরমুক্তের দাগ। উদ্‌মো ষাঁড়! গরিবের কথা বাসি হলে ফলে!... আমার বুক-ভরা বেদনা-ঝঞ্ঝা এনে এই বাঁধন-হারার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দুরন্ত তরঙ্গ-সংঘাত আর কল-কল্লোল জাগিয়ে দেওয়ার যে বদনাম তুই আমার ওপর দিয়েছিস, তাতে সত্য হলে আমি সগৌরবেই সায় দিতাম। কিন্তু আদতে যে সেটা ভুল বোন। এ ঘর-ছাড়া পাগলের দলকে কে যে কোন্ চিরব্যথার বন থেকে ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে, তা আমিও বলতে পারব না, তুইও পারবিনে, এমনকি ওই ঘর-ছাড়া পাগল নিজেই বলতে পারবে না!সে তো আজকের গৃহ-হারা নয় রে রেবা, সে যে চির উদাসী, চিরবৈরাগী! সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধল না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি-গতিতে ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে! এরা সবাই কান খাড়া করে আছে, কোথায় কোন্ গহন-পারের বাঁশি যেন এরা শুনছে আর শুনছে! যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ-রাগ, এরা তখন শোনে বিদায়ী-বাঁশির করুণ গুঞ্জরন! এরা ঘরে বারেবারে কাঁদন নিয়ে আসছে, আবার বারেবারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্চে!

ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর করে নেবে! এরা বিশ্ব-মাতার বড়ো স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকালের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি যে এরা! এদের যাকে আমরা ব্যথা বলে ভাবি, হয়তো তা ভুল! এ খ্যাপার কোনটা্ যে আনন্দ, কোনটান যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়! এরা সারা বিশ্বকে ভালোবাসছে, কিন্তু হায়, তবু ভালোবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছে না! এদের ভালোবাসার ক্ষুধা বেড়েই চলেছে, তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্নেহকে আজও বিশ্বাস করতে পারল না এরা। তার কারণ ওই বন্ধন-ভয়। এদের ভালোবাসা এত বিপুল আর এত বিরাট যে, হয়তো তোমরা তাকে উন্মাদের লক্ষণ বলেই ভাব।... আর অগ্নির কথা? আগুন যদি না থাকবে, তবে এদের চলায় এমন দুর্বার গতি এল কী করে? এরাই পতঙ্গ, এরাই আগুন। এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। আগুন তো এদের খেলার জিনিস।

আগুনে এ যে কত বার ঝাঁপ দেবে, কত বার পুড়বে, কত বার বেরিয়ে আসবে, তা তুই তো জানিসনে, আমিও জানিনে!

তোর সহজ বুদ্ধি দিয়ে তুই সহজভাবে নূরুকে যেরকমভাবে বুঝে আমায় চিঠিতে লিখেচিস, তা দু-এক জায়গা ছাড়া সবই সত্যি। হয়তো আমার ভুল হতে পারে বুঝবার, তবে কিনা, তোদের সংসারী লোকের চেয়ে সংসারের বাইরে থেকে নানান ব্যথা-বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা মানব-চরিত্র বা মানুষের মন বেশি করে বুঝি আর সেই হিসাবেই আমি এই বাঁধন-হারাদের সম্বন্ধে এত কিছু মনস্তত্ত্ব বা দর্শন লিখে জানালেম তোকে।

নূরুকে স্রষ্টার বিদ্রোহী বলে তোর ভয় হয়েছে বা দুঃখ হয়েছে দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে লো! নূরুটাও স্রষ্টার বিদ্রোহী হল, আর অমনি স্রষ্টার সৃষ্টিটাও তার হাতে এসে পড়ল আর কী!... এখন ওর কাঁচা বয়েসে, গায়ের আর মনের দুই-এরই শক্তিও যথেষ্ট, তার শরীরে উদ্দাম উন্মাদ যৌবনের রক্ত হিল্লোল বা খুন-জোশি তীব্র উষ্ণ গতিতে ছোটাছুটি করচে, তার ওপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী

উচ্ছৃঙ্খল বাঁধন-হারা সে, – অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরও অসম্ভব সৃষ্টি-ছাড়া কথাই বলবে! এখন সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝেই শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে ফেলে! একটা বলবান জোয়ান ষাঁড় যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন খামখাই সে কত দেওয়ালকে কত গাছকে ঢুঁস দিয়ে বেড়ায় দেখেছিস তো? এটা ভুলিসনে যেন রেবা যে, এ-ছেলে বাংলাতে জন্ম নিলেও বেদুইনদের দুরন্ত মুক্ত-পাগলামি, আরবিদের মস্ত গোর্দা, আর তুর্কিদের রক্ত-তৃষ্ণা ভীম শ্রোতাবেগের মতো ছুটছে এর ধমনিতে-ধমনিতে। অতএব এসব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আদত সত্য কোন্‌খানে, সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে। এত বড়ো যে ধর্ম, তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য ইত্যাদি-ইত্যাদি কত রকমের না বাইরের খোলস-মুখোশ রয়েছে, তাই বলে কি এই সব অনিত্য সত্যকে ধর্মের চিরন্তন সত্য বলে ধরতে হবে? অবিশ্যি সত্য কখনও অনিত্য বা নৈমিত্তিক হতে পারে না, শুধু কথাটা বোঝাবার জন্যে আমাকে ওরকম করে বলতে হল। প্রত্যেক ধর্মই সত্য – শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো ধর্মকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃঙ্খলা দিয়ে কখনও বিচার করব না ; আর তা করতে গেলে কানার হাতি দেখার মতোই ঠকতে হবে ; তেমনি মানুষকে – তার চির-অমর আত্মাকে – তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অন্তর-দেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই! তার বাইরের মিথ্যা আচার-ব্যবহারকে সত্য বলে ধরব কেন?

হয়তো আমি কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলতে পারছিনে, আর পারবও না, কেননা, আমার মনের সে-শান্ত স্থৈর্য নেই। মন শুধু বাইরে বাইরে ছুটে বেড়াচ্চে। তবে এরই মধ্যে আমার বলবার আদত সত্যটুকু খুঁজে বের করে নিয়ো।... হাঁ, আদত মানুষটাকে বুঝতে হলে অবিশ্যি তার এই আচার-ব্যবহারগুলোকেই প্রথমে ঘেঁটে দেখতে হবে। কিন্তু এ ঘেঁটে সব সময় মুক্তি পাওয়া যায় না, অনেক সময় কাদা-ঘাঁটাই সার হয়। যাক, তাহলেও মানুষ মাত্রেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। যারা এই সব 'স্রষ্টার বিদ্রোহী' তরুণদের গালি দেয়, তারাই বা 'স্রষ্টার রাজভক্ত' প্রজা হয়ে সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোনো খবরাখবর রাখে কি? আর পাঁচ জনের মতন শুধু চোখ বুঁজে অন্ধবিশ্বাসে অন্ধের মতন হাতড়িয়ে

বেড়ানোতেই কি সে অনাদি অনন্ত সত্যকে তারা পাবে? যারা এইরকম বিদ্রোহীদের নাস্তিক ইত্যাদি বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাড়া করে, তারা আস্তিক হয়েই সে পরম পুরুষের কতটুকু খবর রাখে? তাঁর খবর রাখা, তাঁকে ভাবা তো অন্য কথা, তাঁকে – সত্যকে যে অহরহ এই আস্তিকের দল প্রতারণা করচে, এ ভণ্ডামি কি তারা নিজেও বোঝে না? মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এগুলো তো বাইরের বিধি। কিন্তু এগুলোকেই কি তারা ভালো করে মেনে চলতে পারে? মন্দিরে গিয়ে দেবতার মুখস্ত মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু মন থাকে তার লোকের সর্বনাশের দিকে! মসজিদে গিয়ে নামাজের ‘নিয়ত’ করেই ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা! এই ভণ্ডামি এই প্রতারণাই তো এদের সত্য! অতএব এদের মতো এমনই করে আত্মাকে বিনাশ না করে তাদেরই একজন যদি সত্যকে পাওয়ার জন্যে নিজের নতুন পথ কেটে নেয়, তবে এরা লাটি-সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই – কিন্তু নিবীর্যের মতো! একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মতো শক্তি এ-মিথ্যুক ভণ্ডদের যে বিলকুল নাস্তি! ও কেবল ভীত সারমেয়ের দাঁত-খিঁচুনি মাত্র। এরা যে মিথ্যাকে, প্রতারণাকে কেন্দ্র করেই আত্মাকে ক্রমেই নীচের দিকে ঠেলচে, তা এটা বুঝলেও কিছুতেই স্বীকার করবে না। সত্যকে স্বীকার করবার মতো সাহসই যদি থাকবে, তবে এদের এমন দুর্দশাই বা হবে কেন? মনসুর যখন বিশ্বের ভণ্ড-মিথ্যুকদের মাথায় পা রেখে বলেছিল, – ‘আনাল হক’ – আমিই সত্য – সোঽহম, তখন যেসব বক-ধার্মিক তাঁকে মারবার জন্যে হই-হই রই-রই করে ছুটেছিল, এ লোকগুলো যে তাদেরই বংশধর! এ মিথ্যা ধার্মিকের দলই তো সে দিনে ওই মহর্ষি মনসুরের কথা, তাঁর সত্য বুঝতে পারেনি, আজও পারচে না, আর পরেও পারবে না ; এদের এই রকম একটা দল থাকবেই! কিন্তু যারা সত্যকে পেতে চলেছে, যাদের লক্ষ্য সত্য, যারা সত্যের হাতছানি দেখচে তাদের এই সব শক্তিহীন হীনবীর্য লোক কি থামাতে পারে? সত্য যে চির-বিজয়ের মন্দারমালা গলায় পরে শান্ত-সুন্দর হাসি হাসবে।... তাছাড়া, বিদ্রোহী হওয়াও তো একটা মস্ত শক্তির কথা। লক্ষ লক্ষ লোক যে জিনিসটাকে সত্য বলে ধরে রেখে দিয়েচে, চিরদিন তারা যেপথ ধরে চলেছে তাকে মিথ্যা বলে ভুল বলে তাদের মুখের সামনে বুক ফুলিয়ে যে দাঁড়াতে পারে, তার সত্য নিশ্চয়ই এই গতানুগতিক পথের পথিকদের চেয়ে

বড়ো। এই বিদ্রোহীর মনে এমন কোনো শক্তি মাথা তুলে প্রদীপ্ত চাওয়া চাইছে যার সংকেতে সে যুগ-যুগান্তরের সমাজ, ধর্ম, শৃঙ্খলা, সব-কিছুকে গা-ধাক্কা দিয়ে নিজের জন্যে আলাদা পথ তৈরি করে নিচ্ছে! কই, হাজারের মধ্যে আর নয়শো নিরানব্বই জন তো এমন করে দাঁড়াতে পারে না? তুমি কী বল, এই নয়শো’ নিরানব্বই জনই তা হলে সত্যকে পেয়ে বসে আছে? যে মরণকে ধ্বংসকে পরোয়া না করে না-চলার পথ দিয়ে চলে, কত বড়ো দুর্জয় সাহস তার? আর সত্যের শক্তি অন্তরে না থাকলে তো সাহস আসে না। ... তাছাড়া, প্রত্যেকের আত্মারও তো এক-একটা স্বতন্ত্র গতি আছে। আর সকলের মতো একজন গড্ডলিকা-প্রবাহে যদি না চলে, তা বলে কি তার পথ ভুল? বিশেষ করে বিদ্রোহী হওয়ার যেমন শক্তি থাকা চাই, তেমনই অধিকারও থাকা চাই। কই, আমি তো বিদ্রোহী হতে পারিনে, তুমি তো হতে পার না ; আমাদের মাঝে যে সে বিপুল সহ্য-শক্তি নেই। ... বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মা-কে মা না বলে, কিংবা বলে যে এরা তার বাপ-মা নয়, তাহলে কি সত্যি-সত্যিই তার পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়? যে ক্ষুব্ধ অভিমান তার বুকে জাগে, তার শেষ হলেই মায়ের খ্যাপা ছেলে ফের মায়ের কোলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! কিন্তু এই যে অভিমান, এই যে আক্রোশের অস্বীকার, তা দিয়ে হয় কী? – না, সে তার বাপ-মাকে আরও বড়ো করে চেনে, বড়ো করে পায়। এই রকম করে হঠাৎ একদিন চিরন্তনী মাকেও হয়তো তার পক্ষে পাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া তার যে অধিকার আছে এই অভিমান করবার, এই বিদ্রোহী হওয়ার, কেননা, সে তার মায়ের স্নেহটাকে এত নিবিড় করে পেয়েছে যা দিয়ে সে জানে যে, তার সমস্ত বিদ্রোহ সমস্ত অপরাধ মা ক্ষমা করবেনই। যে স্নেহে যে ভালোবাসায় অভিমান জাগতে পারে, রাগ জন্মাতে পারে, সে স্নেহ-ভালোবাসা কত বড়ো কত উচ্চ একবার ভাব দেখি ! এতে মা-র অপমান না হয়ে তাঁকে যে আরও বড়ো করে দেওয়া হয় রে! তাই মা ঝোঁক-নেওয়া খ্যাপা ছেলের ঝোঁক নেওয়া দেখে ছেলের হাতের মার খেয়েও গভীর স্নেহে চেয়ে চেয়ে হাসেন! এ-দৃশ্য বলে বোঝাবার নয়! ছেলের হাতের এ-মার খাওয়াতে যে মায়ের কত আনন্দ কত মাধুরী তা তো বাইরের লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, কী বদমায়েশ দুরন্ত ছেলে বাবা! কিন্তু যে ছেলে মায়ের এত স্নেহ পায়নি, এমন অধিকার পায়নি,

সে মাকে মারা তো দূরের কথা, তাঁর কাছে ভালো করে কাছ ঘেঁসে একটা আবদারও করতে পারে না! ... তাই প্রথমেই বলেছিলাম যে, এই বাঁধন-হারা নূরু যেন বিশ্ব-মাতার বড়ো স্নেহের দুলাল – ঠিক ‘কোল-পোঁছা’ ছেলের মতন আবদেরে একজিদ্দে একরোখা – আর তোদের কথায় বিদ্রোহী! অনেক ছেলে মরে মরে যাওয়ার পর যে এই খ্যাপাই মায়ের মড়াচে ঝোঁকদার ছেলে! দেখবি, এ-শিশু আবার হাসতে-হাসতে মায়ের স্তন্য-ক্ষীর পান করচে আর আপন মনেই খেলচে!... মা যখন তাঁর দুষ্টু ছেলেকে স্নান করবার সময় সাবান দিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করেন, তখন তার কান্না আর রাগ দেখেছিস তো? সে তখন হাতে-দাঁতে মায়ের চুল ছিঁড়তে থাকে, কিল-চাপড় বর্ষণ করতে থাকে আর চেঁচিয়া আকাশ ফাটিয়ে ফেলে। মা কিন্তু হাসতে হাসতে তাঁর কাজ করে যান। তাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে নীলাম্বরী ধুতিটি পরিয়ে দিয়ে চোখে কাজল টিপটি দিয়ে যখন মুখে ঘন ঘন চুমো খান তখন আবার সেই দুরন্ত ছেলের প্রাণ-ভরা হাসি দেখেছিস? – নূরুটারও এখন হয়েছে তাই। বিশ্ব-মাতা এখন তাকে ধুয়ে-মুছে রগড়ে সাফ করে নিচ্ছেন, আর সেও তাই এই হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিয়েচে। মা যেদিন কোলে নিয়ে চুমো খাবেন, সেদিন কোথায় থাকবে এর এই ভূতোমি আর কোথায় থাকবে এই কান্না আর লাফালাফি। তখন সব সুন্দর – সুন্দর! সুন্দর! এ শুভ দিন তার জীবনে জাগবেই ভাই, দেখে নিস তুই। তবে তার হয়তো এখন অনেক দেরি। তার জীবনে হৃত্য রয়েচে, তবে রুদ্র মূর্তিতে! এর পরেই যখন কল্যাণ জাগবে জীবনে, তখন দেখবি সব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। ছেড়ে দে বোন, ওকে ছেড়ে দে! চলুক ও নিজের একরোখা পথ দিয়ে – কল্যাণকে আপনিই ও খুঁজে নিবে। কল্যাণ নিজেই ওর পিছু পিছু মালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে, সময় বুঝলেই সে এই পাগলার গলায় মালা দিয়ে ওকে ভুজ-বন্ধনে বেঁধে ফেলবে। তুই লাল কালিতে ডগডগে করে লিখে রেখে দে এই কথা। আমি জানি, আমার এ ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবেই ফলবে, যদিও আমি পয়গম্বর নই।

হাঁ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার আর একটু বলবার আছে। আমি তো পূর্বেই বলেছি যে, সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর – যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনও রয়েছে এবং অন্ততেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা

ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিষ্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ওইখানেই। ধর্মের আদত সত্যটা না ধরে এঁরা ধরে আছেন যত সব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান। এঁরা নিজের ধর্মের উপর এমনই অন্ধ অনুরক্ত যে, কেউ এতটুকু নাড়াচাড়া করতে গেলেও ফোঁস করে ছোবল মারতে ছোটেন। কিন্তু এটুকু বোঝেন না তাঁরা যে, তাঁদের 'ইমান' বা বিশ্বাস, তাঁদের ধর্ম কত ছোটো কত নীচ কত হীন যে, তা একটা সামান্য লোকের এতটুকু আঁচড়ের ঘা সইতে পারে না। ধর্ম কি কাচের ঠুনকো গ্লাস যে, একটুতেই ভেঙে যাবে? ধর্ম যে বর্মেরই মতন সহ্যশীল, কিন্তু এ-সব বিড়াল তপস্বীদের কাণ্ড দেখে তো তা কিছুতেই মনে করতে পারিনে। তাঁদের বিশ্বাস তো ওই এতটুকু বা সত্যের জোরও অমনই ক্ষুদ্র, যে, তার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্যে তোমায় আলাদা পথে যেতে দেওয়া তো দূরের কথা, তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করতে দেবেন না। ... এই সব কারণেই, ভাই, আমি এই রকম ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশি ভক্ত, বেশি পক্ষপাতী। তারা সত্যকে পায়নি বলে সোজা সেটা স্বীকার করে ফেলে বলে বেচারাদের হয়েচে ঘাট! অথচ তারা এই সত্যের স্বরূপ বুঝতে, এই সত্যকে চিনতে এবং সত্যকে পেতে দিবা-রাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করচে – এই তো সাধনা – এই তো পূজা, এই তো আরতি। এই জ্ঞান-পুষ্পের নৈবেদ্য চন্দন দিয়ে এরা পূজা করবে আর করচে, তবু দেবতাকে অন্তরে পায়নি বলে মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকারও করচে যে, কই দেবতা? কাকে পূজা করচি? আহা! কী সুন্দর সরল সহজ সত্য! এদের ওপর ভক্তিতে আপনিই যে মাথা নুয়ে পড়ে। এরা যাই হোক, এরা তো মিথ্যুক নয়, এরা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে না – এরা যে সত্যবাদী। অতএব এরা সত্যকে পাবেই পাবে ; আজ না হয় কাল পাবে! আর এই বেচারারা অন্ধ বিশ্বাসীর দল? বেচারারা কিছু না পেয়েই পাওয়ার ভান করে চোখ বুঁজে বসে আছে। অথচ এদের শুধোও দেখবে দিব্যি নাকি-কান্না কেঁদে লোকে-দেখানো ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলবে, – 'আঁ হাঁ হাঁ! – মঁরিঁ মঁরিঁ। ওঁই ওঁই ওঁই দেঁখোঁ তিঁনিঁ!' মিথ্যার কী জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে – সত্যের নামে! ঘৃণায় আপনিই আমার নাক কুঁচকে আসে। তাই তো আমি বলি যে, এই পথ-হারানোটা পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর। তবে যা-কিছু বুঝবার ভুল। গুরুদেব সত্যি-সত্যিই গেয়েচেন, –

‘ভাগ্যে আমি পথ হারালেম পথের মধ্যখানে!’
কোটি কোটি নমস্কার করছি এই মহাঋষির শ্রীচরণারবিন্দে এইখানে! যাক, এসব আলোচনা আপাতত এইখানেই ধামা-চাপা দিলাম। এই কেঁচো উস্‌কাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়েই বোন আমি মনে করি এসব আলোচনা আর করব না ; কিন্তু স্বভাব যায় না মলে! বাপ-মায়ে বুঝেই যে আমার সাহসিকা নাম দিয়েছিলেন, তা আমিও আজ যেন বুঝতে পারচি। তোর চিঠি পেয়ে আমার মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস বা সৃষ্টির বেদনা জেগেছিল, তার দরুণই হয়তো এত কথা লিখে ফেললাম। যতক্ষণ এই ভাবাবেগ আছে ততক্ষণই লিখতে পারব, তারপর আর নয়। তাই ‘ এই বেলা নে ঘরে ছেয়ে’ কথাটার উপদেশ স্মরণ করেই যত পারচি লিখে চলেছি।

আমার বাচ্চা-সই মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে যে ভয় করেছিস তুই, তার কোনো কারণ নেই। আমি তাকে খুব ভালো করেই বুঝেছিলাম যে-কয়দিন ছিলাম তার সঙ্গে। সে সহজিয়া। সেহজেই ওই খ্যাপাটাকে ভালোবেসেছিল, আর এমনই সহজ হয়েই সে তাকে চির-জনম ভালোবাসবে। তার বুকে যদি কখনও যৌবনের জল-তরঙ্গ ওঠে, তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। যে সহজিয়া অতি সহজেই তার প্রিয়তমকে ভালোবাসতে পারে, তার মতো সুখী দুনিয়ায় আর কেউ নেই রে বোন। তার শান্তি তার আনন্দ অনাবিল, পূত, অনবদ্য, – একেবারে শিশির-ধোয়া শিউলির মতো! সে তার সমস্ত কিছু নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে সেই যে এক মুহূর্তেই তার পীতমের পায়ে শেষ একরেখা দীর্ঘশ্বাস আর আধ-ফোঁটা নয়ন-জলের অঞ্জলি অঞ্জলি করে ঢেলে দিয়েচে তার পরে তার আর কোনো দুঃখই নেই! সে জেনেছে যে, সে সব পেয়েছে। সে জেনেছে যে, সে প্রাণ ভরে দিয়েছে আর সে দান দেবতাও বুক পেতে নিয়েছেন। সে জানে – খুব সহজভাবেই জানে – তার এত বুক-ভরা পবিত্র ফুলের দান, তার এমন সহজ পূজা ব্যর্থ হওয়ার নয়। সহজভাবে দিতে জানলে যে অতি-বড়ো পাষাণ-দেবতাও সেখানে গলে যান, নিজেকে রিক্ত করে সমস্ত কিছু ওই সহজ পূজারিকে দান করে ফেলেন। গুরুদেবের ‘কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে’ শীর্ষক কবিতাটা পড়েছিস তো? তাতে তিনি দিন-রাত তাঁর পসরা

হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্চেন, – ওগো আমায় কে কিনে নেবে? কত লোকই এল, – রাজা এল, বীর এল, সুন্দরী এল, কিন্তু হায়, সকলেই 'ধীরে ধীরে ফিরে গেল বন-ছায়ার দেশে।' সকলেরই 'মুখের হাসি ফুরিয়ে গেল নয়ন জলে শেষে!' কিন্তু ধুলো নিয়ে খেলা-নিরত একটি ছোট্ট ন্যাংটা শিশু যখন তুড়ুং করে লাফিয়ে উঠে তার কচি ছোট্ট দুটি হাত ভরিয়ে ধুলো-বালি নিয়ে বললে – 'আমি তোমায় অমনি নেব কিনে!' তখন কবিও তাঁর পসরা ওইখানে ওই সহজিয়ার সহজ চাওয়ার কাছে বিনামূল্যে বিকিয়ে দিয়ে মুক্তি পেলেন। আমাদেরও নয়নপাতা তখন এই সহজের আনন্দে আপনিই ভিজে ওঠে! এমনি সহজ করে চাওয়া চাই, এমনি সহজ হয়ে দেওয়া চাই রে বোন, আর তবেই যে পায় সেও বুক ভরে নেয়, যে দেয় তারও বুক ভরে যায়!... এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে বলেই তো মাহ্‌বুবা আজ ছোট্ট মেয়ে হয়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়েও বড়ো। তাই সে বৈরাগিনীও হল না, সন্ন্যাসিনীও হল না ; ক্রুদ্ধা জননি যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে সঁপে দিলে, তখনও সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোনো দুঃখই নেই, সে যে জানে যে, তার যা দেওয়ার তা অনেক আগেই যে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হয়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছা নিয়ে যাক, তাতে আর আসে যায় না। ... এই সহজিয়া পূজারিনির দল যে আমাদের ঘরে-ঘরে রয়েছে বোন, তবে আমাদের চোখ নেই, – আমরা দেখেও দেখি না এই নীরব পূজারিনিদের। এই সহজিয়া তপস্বিনীদের পায়ে আমি তাই হাজার হাজার সালাম করচি এইখানে! আমাদের বুকে কিন্তু এই মূক মৌন সহজিয়াদের ব্যথাটাই চোখে পড়ে, আর বুকে বেদনার মতোই এসে বাজে। বাস্তবিক বোন, কী করে এই হতভাগিনি (না, ভাগ্যবতী?)-দের বুক এমন সহজ সুখের নেশায় ভরে যায়? এমন সর্বস্বহারা হয়েও কী করে এত জান-ঠান্ডা -করা তৃপ্তির হাসি হাসে? আমরা তা হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না ; কেননা, আগে যে অমনি সহজ হতে হবে ও বুঝতে হবে। ... সেই জন্যেই বলেছিলাম যে, মাহ্‌বুবার জন্যে কোনো চিন্তা করিসনে। সে আনন্দকে পেয়েছে, সে কল্যাণকে পেয়েছে, – সে মুক্তিও পেয়েছে এইখানে। কিন্তু সে এত বড়ো বড়ো কথা হয়তো বুঝবেও না। আমরা যেটা বুঝি চেষ্টা-চরিত্তির করে সে সেটা সহজেই বুঝে নিয়েচে, এইখানেই তো সহজিয়ারা সহজ আনন্দে মুক্ত।

এই সহজিয়া মাহ্বুবা হয়তো সহজেই বন্ধনের মাঝে মুক্তি দিতে পারত। কিন্তু কেন যে তা হল না, সে একটা মস্ত প্রহেলিকা। আমি এখনও এর কিছুই বুঝতে পারছিনে। এইখানটাতেই নূরুটাতে আজ মাহ্বুবাটাতে যে একটা কোনো গুপ্ত জটিলতা আছে, যেটার খেই আমি আজও পাচ্ছিনে। আর, আমার মতন ওস্তাদ যেখানে হার মানলে সেখানে তোর মতন চুনো-পুঁটির তো কর্মই নয়! তবে এর নিগূঢ় মর্ম আমি বের করবই করব, এই বলে রখলাম তোকে!

আমার বিশ্বাস, মাহ্বুবাটা এই বাঁধন-হারাকে সইতে পারবে না বলে মিথ্যা ভয়ে তাকে মুক্তির নামে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ মাত্র। এটা না হওয়াই সম্ভব, কারণ সে মেয়ে যে সহজিয়া, তার তো এ ভয় হওয়ার কারণ নেই! ... দেখি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

একা মাহ্বুবার মা বেচারিই রাক্ষুসি হবে কেন, রেবা? এ-রকম রাক্ষুসি মা – যারা জেনে-শুনে মেয়ের সর্বনাশ করে – তোদের সমাজে, হিন্দুর সমাজে এমনকি, আমাদের স্বাধীন সমাজেও তো কিছু আশ্চর্য নয় আর কমও নয়। এই তো সতীত্বনাশ! অবিশ্যি, সতীত্ব বলতে মনের না দেহের বোঝেন এঁরা, তা জানিনে ; কিন্তু আমার কথায় সতীত্ব তো মনে। মনে মনে যাকে স্বামিত্বে বরণ করলে মেয়ে, তা জেনে শুনেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে দুটো মন্ত্র আউড়িয়ে জোর করে এই বোবা মেয়েদের যে কসাই মা-বাপ হত্যা করে! তাহলে প্রকারান্তরে মা-বাপেই মায়ের সর্বনাশ করলে না কি? উলটো আবার সম্প্রদানের সময় মেয়েকে সীতা সাবিত্রী হতে বলা হয়? কী ভণ্ডামি দেখছিস!

তোর শাশুড়ি সম্বন্ধে অভিমান করে যে অভিযোগ করেছিস, তা নেহাত অন্যায় হয়নি তোর পক্ষে। কেননা, সংসারের গিন্নির এরকম ঝাল ছাড়তে হয় মাঝে মাঝে। তবে যখন ঘরের গিন্নিও হয়েছিস লো, তখন ঘর-গেরস্থালির একটু ঝাঁঝ সইতে হবে বই কি! এখনও তোর 'যৌবন' বয়েস কিনা (অর্থাৎ ভোগের সময়!) তাই

মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে। তবে এও সয়ে যাবে। জানিস তো, কাঁচা লঙ্কা গিন্নিদের বড্ড প্রিয়! এ ঝাল না থাকলে সংসার মিষ্টিও লাগে না আর তাতে রুচিও হয় না।

তোর শাশুড়ি বেচারির একেবারে সাদা সরল মন। সারা-মন-প্রাণ তাঁর মায়ের স্নেহে ভেজা। এসব লোক সংসারে থেকেও চিরদিন একটু উদাসীন গোছের। সংসারের বাজে ঝক্কি এঁরা নিমের রস গেলা করেই গেলেন। যেই দেখেন, আর একজনের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে একটু আরামে নিশ্বাস ফেলতে পারবেন অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাইতো তোর হাতে সব কিছুর ভার সঁপে দিয়ে তিনি নিরিবিলির অত্যন্ত শান্তিতে ডুবতে চাইছেন। ওঁর খেলার সাথি এখন তোর কচি মেয়ে আনারকলি, কেননা, উনিও যে এখন তোর আর একটি নেহাত ঠাণ্ডা মেজাজের লক্ষ্মী মেয়ে আর সেইজন্যই তো তুই তাঁর লক্ষ্মী-মা। আহা, ওঁর এ-শান্তিতে বাধা দিসনে বোন! এ তপশ্চারিণীর নীরব পূত তপোবনে গিয়ে গোলমাল করে আর তাঁর শান্তি ভাঙিসনে। জানি ওঁর দুঃখ অনেক, আর তাইতেই তো তিনি এখন শান্তির ছায়া খুঁজছেন। বাড়িতে থেকেও এসব লোকের অস্তিত্ব বোঝা যায় না, কিন্তু বাড়ির সমস্ত শান্তিটুকুকে ঘিরে রয়েছেন এঁরাই, বিহগ-মাতার ডানার মতো করে।

এঁরা যখন চলে যান, তখনই বুঝতে পারি যে, কী এক শূন্যতায় সারা সংসার ভরে উঠেছে।

হাঁরে, ভালো কথা! তুই এ চিঠিতে খুকির কথা লিখিসনি যে বড্ড? প্রথমে এটা আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু শেষে জানতে পেরে হাজারবার তন্ন-তন্ন করে তোর চিঠি খুঁজেও আমার 'আনারকলি' মা-র নাম-গন্ধও পেলাম না, আমার এতে কান্না পেয়ে গেল রাগে! আচ্ছা ভোলা মেয়ে তুই যা হোক লো! বোধ হয় মেয়েটাকে চিরদিন এমনই অনহেলাই করবি, না? জানি, তুই তোর হাজার কাজের ওজর করবি! চুলোয় যাক তোর কাজ, এমন আনারকলির মতোই এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে, – হায়, তাকে কখনও তোকে বুক ভরে সোহাগ করতে দেখলাম না। এ আমাদের বুকে বড়ো লাগে বোন! অমন মা হতে গিয়েছিলি কেন লো তবে

মুখপুড়ি? 'মা' আসবার আগেই হয়তো এই মা-কাঙালি 'মেয়ে' এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এখনও কি তোর মাঝে 'মা' জাগল না? না, হাতের কাছে পেয়েই এত অনহেলা? দেখ, তোর নাড়ির মাঝে যে মা এখনও সুপ্ত। খুকির বাবা রবিয়ল সাহের পুরুষ হলেও তাঁর মাঝে সেই মা কী স্নেহময়ী মূর্তিতে জাগ্রত! কিন্তু এই ছেলের জাত কী নিমকহারাম, সে যা পায় তাকে ছেড়ে দিয়ে যেটা পায় না সেইটাকেই পাবার জন্যে হাঁকুচ-পাঁকুচ করে। বাপের এত স্নেহ পেয়েও তাই সে যে বেশি করেই তোর কোলের – মায়ের কোলের কাঙাল, তা তো আমি নিজেই দেখেচি।

সত্যি ভাই, এ কচি মেয়েটাকে পেলে আমি যেন এখন বেঁচে যাই। আমি ওকে এখনই চাইতাম, কিন্তু দুষ্টু তুই হয়তো একটা বদমায়েশি বিদ্রুপ করে বসবি বলে থেমে গেলাম। খুকি বড়ো হলে কিন্তু আমার কাছে এসে থাকবে আর লেখাপড়া শিখবে বলে কথা দিয়েছিস, মনে থাকে যেন।

সোফিটার অত্যাচারে তুই নাজেহাল হয়ে গিয়েছিস শুনে আমি আর হেসে বাঁচিনে। আচ্ছা, জব্দ, না? ও জন্ম হতেই বড্ড বেশি আদর-সোহাগ পেয়ে মানুষ হয়েছে কিনা, তাই এত দুরন্ত! তা নাহলে তোদের হারেমের আইবুড়ো থুবড়ো মেয়ে কি বলতে পারত 'আমি বিয়ে করব না, থুবড়ো থাকব'? ও এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। তবে বিয়ে হওয়ার পর বরের হাতে পড়ে হয়তো বাগ মানলেও মানতে পারে। ওর আদত ইচ্ছে কী জানিস? ও নূরুটাকে বিয়ে করতে চায়। আমায় একদিন কানে কানে বলে ফেলে আমার হাসি দেখে সে কী ভাই রাগ আর লজ্জা তার! কেঁদে-কেটে তো একাকার – অথচ খামখাই! আমি আর হেসে বাঁচিনে।

তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছি যে, এ কথাটা কী আমি আর সবাইকে বলতে পারি রে, যে, আমার ছোটো বোন ভালোবাসায় পড়েছে! যতই হোক, আমি তো তার সাহসী দিদি, তবে তখন সে চুপ করে। দেখিস ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই যেন এ-কথা আবার বলে দিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিসনে! এ-পাগলি ছুঁড়িটার যৌবন কিন্তু বয়সের অনেক পেছনে পড়ে ; হয়তো বিশ বছর বয়সে গিয়ে

তবে কখনও ওর যুবতির লজ্জা আসবে। তবে বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা কথা। কেননা, তখন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হবে কিনা।

তোর খেলার সাথি বেচারার দুঃখে আমি এতটুকুও সহানুভূতি দেখাতে পাচ্ছিনে, কেননা তিনি এমন মূক না হয়ে গেলে কি আর তোর আমায় এখন মনে পড়ত রে ছুঁড়ি!

হাঁ, সোফির বিয়েতে যাব বই কি! তা নাহলে ওকে বাগ মানাবে কে? হয়তো বিয়ের সময়ই রেগে দোর দিয়েই বসে থাকবে! ওকে বলে দিস বোন যে, সে বিয়ে যদি নেহাতই না করে, তবে আমার স্কুলের মেয়ে দফতরি করে দেওয়া যাবে। দেখিস সে যেন ঠাট্টা মনে না করে। তা হলেই আমি হাবাৎ আর কি?

আমার বরের ভাবনা নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না লো, তুই নিজের চরকায় তেল দে! 'যার বিয়ে তার ধুম নেই পাড়া-পড়শির ঘুম নেই!' যত দিন না আমার সন্ন্যাসীঠাকুর আসবেন ততদিন আমায় সন্ন্যাসিনীই থাকতে হবে বই কি! সংসার না ডাকলে তো আর সংসারী হতে পারিনে নিজে সেধে! থাক, আরও অনেক বলবার রইল! খুকিকে চুমু দিস। ইতি

তোর সাহসী সই
সাহসিকা

——————

শেঙান
১লা আষাঢ়
দুপুর রাত্তির
শ্রীচরণসরোজেষু!

সাহসিকাদি! বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝা যত বইবার, বয়ে গেল আমার জীবনের ওপর দিয়ে। কিন্তু বৃষ্টি আজও থামেনি। আজ পয়লা আষাঢ়। আমার জীবনের এ-আষাঢ় বুঝি আর ফুরোবে না। আশীর্বাদ করো দিদি, সত্যিই এ আষাঢ়ের যেন আর শেষ না হয়।

বিয়ের পর আর কাউকে চিঠি দিইনি। আমার এত শ্রদ্ধার মা, দাদাভাই রবিয়ল সাহেব, এত ভালোবাসার ভাবিসাহেবা – সোফি – সকলের মাঝে যেন একটা মস্ত আড়াল পড়ে গেছে। আমি যেন কাউকেই আর ভালো করে দেখতে পাচ্ছিনে। সব মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে – আমার মনের মুকুরে দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া লেগে! আজ আমার মনে হচ্ছে দিদি, যেন তুমি ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই। শুধু তুমিই আমার মনে আজও ঝাপসা হয়ে ওঠনি। তাই আজ আমার মনের সকল দ্বন্দ্বগ্লানি কাটিয়ে উঠে তোমার পানে সহজ চোখে চাইতে পারছি। তাই আবার বলছি, সাহসিকাদি, আজ তুমিই, – একমাত্র তুমিই আমার গুরু, আমার বন্ধু, আমার সখী – সব আজ আমি মনের কথা যেন মন খুলে বলতে পারি তোমার কাছে। আজ যেন আমি আত্মপ্রবঞ্চনা না করি!

আর আপনাকে ফাঁকি দিতে পারিনি দিদি! আজ আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের সাথে সাথে আমারও মন যেন ভেঙে পড়ছে! মনে হচ্ছে, মাটির মতো করে আমায় কেউ চাক, আমিও আষাঢ় মেঘের মতো নিঃশেষে নিজেকে ঝরিয়ে দিই তার বুকে। নিজেকে জমিয়ে জমিয়ে যে-ভার বিপুল করে তুলেছি নিজেরই জীবনে, আজ আমি মুক্তি চাই সে-ভার হতে। বিলিয়ে দেওযার সে-সাধনা কেমন করে আয়ত্ত করি বলে দিতে পার, দিদি?

এই তো দুটো চোখ, ক ফোঁটাই-বা জল ধরে ওতে! তবু মনে হচ্ছে আজ যেন আমি আষাঢ়ের মেঘকেও হার মানিয়ে দিতে পারি কেঁদে কেঁদে।

কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র, কত বিদ্যুতের পরিণতি এই বৃষ্টিধারা, এই চোখের জল!

তুমি হয়তো মনে করছ, আমি পাগল হয়েছি। তাও যদি হতে পারতাম তাহলে নিজেকে ভোলার একটু অবসর মিলত। অবসরের চেয়েও বড়ো কথা দিদি, এই স্ত্রী জাতির বড়ো কর্তব্যটা থেকে রেহাই মিলত একটু! তুমি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছ এইবার, কিন্তু দশ আঙুলের ক্ষুদ্র মুষ্টির চাপে এক মুঠো ফুলের দুর্দশা দেখেছ? শুকিয়ে মরতে আমি রাজি আছি দিদি, কিন্তু এমন করে কর্তব্যের মুঠিতলে পিষ্ট হয়ে মরে নাম কিনবার সাধ আমার নেই। নারীজীবনের ফুলহার নাকি বিধাতা প্রেমের গলায় দিবার জন্যই গেঁথেছিলেন, কবিরা তাই বলেন ; কিন্তু তাকে মুঠি-তলে পিষবার আদেশ যে শাস্ত্রকার দিয়েছিলেন, তাঁকে যদি এই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবার সময় শ্রদ্ধা করতে না-ই পারি – সেটা কি এতই দোষের!

বাঁচবার সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন করে জাঁতা-পেষা হয়ে মরবার প্রবৃত্তিও নেই আমার। মরতেই যদি হয় দিদি, তাহলে সে-সময় কাছে আমার চাওয়ার ধনকে না-ই পাই, অন্তত আমার চারপাশের দুয়ার-জানালাগুলো যেন খোলা থাকে। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো বায়ুর যেন সেদিন অভাব না হয়, এই ধরণি-মা-র মুখের পানে চেয়ে প্রাণ ভরে কেঁদে নেওয়ার মতো অবকাশ যেন সেদিন পাই দিদি, এইটুকু প্রার্থনা করো – শুধু আমার জন্যে নয় – আমারই মতো বাংলার সকল কুলবধূর জন্য!

দেখেছ, নিজের দুঃখটাকে ফেনাচ্ছি এতক্ষণ ধরে ; সুখের তলানিটার পরিমাপ করতে যেন ভুলেই গেছি। আমার জীবনের পাত্র উপচে যেটা পড়ছে নিরন্তর – সেইটাই দেখলাম শুধু নীচে জমা হয়ে রইল যা তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হল না – এ যে শুধু তুমিই ভাবছ তা নয় – আমিও ভেবেছি বহুদিন, আজও ভাবি। কিন্তু দিদি, তলানিটাকে যখন দেখি একটা চোখে যতটুকু জল ধরে তার চেয়েও কম, তখন সেটার ক্ষতিপূরণ করতে এই পোড়া চোখের জল ছাড়া আর কী থাকতে পারে – বলতে পারো?

আমার স্বামী দেবতা মানুষ। অর্থাৎ দেবতার যেমন ঐশ্বর্যের অভাব নাই আবার লোভেরও ঘাটতি দেখিনে তেমনই। তাঁর সম্বন্ধে অপবাদ আমি দেব না, দিলে

তোমরা ক্ষমা করবে না। ঐশ্বর্যে তাঁর আকর্ষণ যত বেশিই থাক, অমৃতে তাঁর অরুচি নেই এবং ওটার জন্য আবদার হয়তো একটু অতিরিক্ত রকমেরই করেন। আহা বেচারা! দেখে দয়া হয়! ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, – সমুদ্র মন্থন চলেছে, ভালো ভালো জিনিস সব দেবতারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছেন, বেচারা দানব-দৈত্যের দল বানরের পিঠে ভাগ করার সময় বেড়ালের মুখ যেমন হয়েছিল তেমনই মুখ করে দাঁড়িয়ে, – ক্রমে উঠলেন লক্ষ্মী, সুধার ভাঁড় হাতে নিয়ে এবং তাঁকে অধিকার করে বসলেন বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটি। এতক্ষণ যদিই বা সয়েছিল – এই বার দেবতা দানব কারুরই সইল না! লাগল একটা গণ্ডগোল – এবং এই গন্ডগোলের অবকাশে বৈকুণ্ঠের চতুর ঠাকুরটি লক্ষ্মীঠাকুরণকে নিয়ে একবারে পগার পার! দ্বন্দ্ব যখন মিটল তখন সুধার অংশ হয়তো সব দেবতাই পেলেন, কিন্তু জিতে গেলেন যে ঠাকুরটি তিনি যে সুধাসমেত সুধাময়ীকে পেলেন – এ ব্যথা আমরা ভুললেও দেবতারা ভুললে না। তা আমার স্বামী দেবতাকে দেখেই অনুভব করছি। উনি যা বলেন, তার মানে ওই রকমেরই কতকটা। ওঁর মাঝে আবার একটা দুষ্ট দানবও প্রবেশ করেছে – জানিনে কোন পথ দিয়ে। ওঁর মাঝের দেবতা যখন অমৃতের জন্য অভিযোগ করেন নিরুদ্দেশ ঠাকুরটির উদ্দেশে, তখন দৈত্যটাও মুষ্টি পাকায় ক্রুদ্ধ রোষে, বোধ হয় বলে, পেতাম একবার এই হাতের কাছে! আমার স্বামী রসিক মানুষ, এই কথাটা তিনিও একদিন আমায় বলেছিলেন – আফিমের নেশার ঝোঁকে। অবশ্য, তাঁর বলার ধরনটা ছিল অন্য ধরনের, মোদ্দা মানে তার ওই এক যে, সুধায় তিনি বঞ্চিত হলেন, তাঁর সুধাময়ীকে চোরে নিয়ে গেল!

সেদিন আমার মনটা হয়তো ভালো ছিল না, আমি বলেছিলাম কী, দিদি জান? বলেছিলাম,সেই চোরটি যদি বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটির কাছে একটু চতুরালি শিখতই, তাহলে তাকে আজ জীবনে এত বড়ো ঠকতে হত না। সে তাহলে সুধাময়ীকেও চাইতো সুধার সাথে। স্বামী আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছিলেন, বোধ হয় বুঝতে পারেননি ভালো করে আমার হেঁয়ালি। বুঝলে আমার ভাগ্যে হয়তো এ দেব-লোক অক্ষয় না হতেও পারত।

স্বামী আফিম খেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে গেছেন, আমারও এক একবার লোভ হয় দিদি, যে, ওই আফিমের অংশ নিয়ে আমিও চিরজনমের মতো বেঁচে যাই? যে লোভটা ওই উৎকট দিকটায় এত করে আকর্ষণ করে আমায় – সেই লোভটাই আবার মিষ্টি কোনো ভবিষ্যতের পানে ইশারা হেনে বলে – ওরে হতভাগি বেঁচে থাক, বেঁচে থাক তুই, সারা জীবনের ক্ষতি তোর এক মুহূর্তের কল্যাণে পুষ্পিত হয়ে উঠবে। তোর প্রতীক্ষার ধন ফিরে পাবি! তোর মৃত্যুক্ষণ হাসির রঙে রেঙে উঠবে! – আমিও তার সাথে সাথে বলি, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। – যাকে আমি বাম হস্তের বারণ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, দক্ষিণ হস্তের বরণমালা দিয়ে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত না করি, তাহলে আমার আর মুক্তি নেই ইহকালে।

আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন রুপার দরে যাচাই করতে। শুনে খুশি হবে যে, এ সওদায় তিনি ঠকেননি। কিন্তু এর জন্য স্বামীকে খোঁচা দিয়ে লাভ নেই। এই তো আমাদের বাংলার – অন্তত শরিফ মুসলমান মেয়েদের – চিরকেলে – একঘেয়ে কাহিনি। আমাদের সমাজের স্ত্রী-শিকারি অর্থাৎ স্বামীরা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে শিকার করেন আমাদের। তাঁরা আমাদের দেখতে পান না বটে, কিন্তু শুনতে পান। রূপের একটা অভিশাপ আছে, হেরেমের দেয়াল ডিঙাতে তার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। প্রভাত-আলোর মতো, ফুলের গন্ধের মতো তার খ্যাতি ঘরে-ঘরে দেশে-দেশে পুরুষের কানে গিয়ে পৌঁছে। কোথাও ভালো শিকার আছে শুনলেই পুরুষ ছোটেন সেখানে, সেই শব্দভেদী বাণের কল্যাণে তাঁদের হয়ে যায় শাপে-বর – কিন্তু এই হতভাগিনিদের বরই হয়ে ওঠে শাপ।

আমার স্বামী শিকার করে করে প্রধান হয়েছেন, হাত তাঁর পাকা, লক্ষ্যও অব্যর্থ। কাজেই আমার রূপের খ্যাতি তাঁর কাছে পৌঁছবার পরেও তিনি চুপ করে বসে থাকবেন – তাঁর বীর চরিত্রে এত বড়ো অপবাদ দিবার সুযোগ তিনি দেননি। ছুঁড়লেন শব্দ লক্ষ করে বাণ, বাণের রৌপ্যফলকে বিঁধে আমার বক্ষের অবস্থা যা-ই হোক, তাঁর মুখে হাসি যে ফুটল তা খাঁটি সোনার। এইখানে শুনে খুশি হবে দিদি, তাঁর দাঁত সব সোনার। খোদার দেওয়া হাড়ের দাঁতের লজ্জা তিনি দূর করেছেন ও-দাঁত খসে পড়তেই। এখন তিনি সোনায় দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছেন। তাঁর গোশত

খাওয়া এবং বিবাহ করা দুই শখই অক্ষয় হয়ে গেল! বিজ্ঞানের জয়জয়কার হোক, আমাদের মতো বহু হতভাগিনির স্বামীর যৌবন এই বিজ্ঞানের কৃপায় অটুট হয়ে রইল!

আমার স্বামী জমিদার এ শুনে আমারই জাতের অনেক হতভাগিরই বুক চচ্চড় করবে – সতিনের মতো। কিন্তু আমার কপাল এমনই মন্দ দিদি, যে এই জমিদারির পঙ্খিরাজে চড়েও আমার দিগ্‌বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আর জাগল না কোনও দিন।

স্বামী নব নব অলংকারে আমার বন্দনা করেন। কিন্তু প্রসন্ন যে হতে পারি না – এর ওষুধ কি!

অলংকারে কাব্যদেবীর সুষমালক্ষ্মীর দাম বাড়ে, কিন্তু মাটির মানুষের দাম ওতে বাড়ে না কমে – বলে দিতে পার দিদি? হাটে যে বিকাল মাটির দরে, তাকে নিয়ে এ বিদ্রুপ কেন? হায় রে হতভাগিনি নারী, প্রাণের ডালা তার শূন্য রইল বলে দেহের ডালা সাজিয়ে সে হেসে বেড়ায়! অলংকার সুন্দর, কিন্তু ও কঠিন বস্তু দিয়ে প্রাণের পিপাসা মেটে না। তাছাড়া পাষাণের বেদির বুকে থাকতে হয় যাকে পড়ে – তার গায়ে অলংকার বড়ো বাজে দিদি। অলংকার দিয়ে রূপ আমার খুলল কিন্তু মন কিছুতেই খুলল না, তাই বলেন আমার স্বামী।

অদ্ভুত এই মানুষের মন। যে মানুষ, মানুষ খেয়ে খেয়ে এতটা মোটা হল, আজ সেই মানুষই মানুষের একটুখানি করুণার জন্য কত কাঙাল হয়ে উঠেছে! দেখলে দুঃখ হয়! আমার স্বামী জমিদার, এটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। জমিদার নামের পেছনে একটা কৌতূহল আছে। রাজার ওঁরা পাড়াগেঁয়ে সংস্করণ, তাই লোকের বিশ্বাস – কত না জানি রূপকথার সৃষ্টি হচ্ছে ওখানে। হয়তো বা হচ্ছেও! আমার স্বামী জমিদার একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভুলেন না। তাঁর প্রতাপে দেশে যে ইংরেজ বলে এখনও কোনো শাসনকর্তা আছে, একথা ভুলে গেছে তাঁর জমিদারির লোক! আর, টাকাকড়ি? ইচ্ছা করলে আমায় বনবাস দিয়ে স্বর্ণসীতা গড়ে পাশে বসাতে পারেন! কত নারী তাঁকে অত্মদান করে ধন্য হয়ে বেহেশ্‌তে চলে গেছে

হাসতে হাসতে! যাওয়ার বেলায় তাদের এই সালংকার জমিদার-স্বামীর জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে এই ভেবে, যে, কোনো মুখপুড়ি আবার তাঁর ঐশ্বর্যের ওপর বসে তার প্রভুত্ব চালাবে! গয়না ও টাকা ছাড়া যে মেয়েলোক আরও কিছু চায়, এই নতুন জিনিসটের সঙ্গে যখন পরিচয় হল তাঁর আমার কৃপায়, তখণ এই হতভাগ্যের দুঃখ দেখে আমার মতো পাষাণীরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বলতে সে পারে না ঠিক প্রকাশ করে কিন্তু তার মুখ দেখে আমার বুঝতে বাকি থাকে না – কী যন্ত্রণাই তার আজ হচ্চে! আজ সে যেন বুঝেছে, জীবনে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া যেটা, সেইটে থেকেই সে বঞ্চিত রয়ে গেল! অন্যের ভালোবাসার যে কত দাম, তা বুঝেছে বেচারা – যখন তার জীবন-প্রদীপের তৈল ফুরিয়ে এসেছে। সে আবার চায় যৌবন-ভিক্ষা – হয়তো সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও, সে তার সারা জীবনের ক্ষতিকে একদিনে আত্মদানে ভুলতে চায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে-ই জানে, যে তা আর হয় না! তবু সে আমার পায়ে-পায়ে ঘুরে মরে! আমার রূপ তার গায়ে যে কখন কঠিন হয়ে বাজল জানি না, কিন্তু এ আমার বেশ স্মরণ আছে যে, সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না – এমনই একটা ভাব নিয়ে আমার দিকে পাগলের মতো করে সে একদিন চেয়েই ছিল। মনের জাদুস্পর্শে কোমল না হলে রূপ যে স্ত্রী-শিকারের বাণের রৌপ্য-ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে এ-শিক্ষা তার সেদিন নতুন হল। রূপা দিয়ে মানুষ যাচাই করেও যে সবচেয়ে বড়ো ঠকা ঠকতে হয়, এ-শিক্ষা হল তার আমায় দিয়ে প্রথম। অলংকার দিয়ে আমার ওজন করতে পারল না বলে – তার ঐশ্বর্যের স্বল্পতা ধরা পড়ল তার চোখে!

এখন সে ঐশ্বর্যকে পিছনে ফেলে নিজেকে অঞ্জলি করে এনেছে আমার চরণতলে অর্পণ করতে, এটাই আমার মনকে মাধুর্যে-বেদনায় অভিভূত করে ফেলেছে। একটা দুর্দান্ত পশুকে জয় করার গৌরব কি কম! আমার যদি দেওয়ার থাকত রূপ, দেহ ছাড়া আর কিছু পুঁজি, সব দিতাম – এ বেচারার মৃত্যুপাণ্ডুর অধরে নিঙড়ে! কিন্তু এ যা চায় তা আমি পাই কোথা দিদি? রাবণ রামের সীতাকে হরণ করেছিল এইটেই লোকে শিখে রেখেছে, কিন্তু সীতা রামকে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে এমনই একটা মহাকাব্য লিখবার বাল্মীকি কেউ নেই?

থাক, সোজা কথায় খেয়ে-দেয়ে আমি দিব্বি মোটা হচ্ছি। দুটো বাঘে খেয়ে উঠতে পারে না – এমনই গতর হয়ে উঠেছে আমার। আমার কপাল ভালো, স্বামীর আমার কোনো পক্ষের কোনো ছেলেপিলে নেই। অতএব আমি মুক্তপক্ষ। সেবা, আদর যা-কিছু স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়ার নেই।

তোমাদের খবর জানবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি, এই বুঝে যা হয় একটা বিহিত করো।

আমার বোধ হয় আর বেশি চিঠি দেওয়া হবে না দিদি। মন একটা বিস্বাদ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ছে দিন দিন, আর কিছু করতে – এমনকি চিঠি লিখতেও মন চায় না। রাতদিন রাজ্যের বই আনিয়ে পড়ি। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি, মন আমার আরব-সাগরের উপকূলে তরঙ্গের মতো মাথা খুঁড়ে মরতে চায়।

আশীর্বাদ করো দিদি, এই মাথাটা যেন কল্যাণের চরণতলে এইবার নোয়াতে পারি।

ইতি –
হতভাগিনি
মাহ্‌বুবা

–––––

বোগদাদ
২৩শে চৈত্র
শ্রীচরণারবিন্দেসু!

সাহসিকাদি! এই হয়তো আমার শেষ চিঠি। কিন্তু এই শেষ চিঠিটা লিখতেই একটা বছর পেরিয়ে গেল। ফুল জমে পাথর হয়ে গেছে, দেখেছ? আমি কিন্তু দেখেছি।... যাক, ওসব কথা বলতে আসিনি আমি। কয়েকটা খবর আছে দেওয়ার, তাই দিই।

অবসর যে নেই, তা নয় – এখন বরং অবসরটা চাওয়ার চেয়ে বেশিই হয়ে উঠেছে। আর সেটা এত বেশি হাতে জমেছে বলেই হয়তো খরচ করতে এত কার্পণ্য। এখন আমার মনে হয়, চিঠি লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে বসে বসে আমার অতীতকে – আপনাদের সকলকে নিয়ে চিন্তার অতলতায় ডুব দেওয়ায় ঢের শান্তি। আমার জীবনে যারা ছিল মানুষ, ধ্যানের মন্দিরে তারা আজ দেবতা। তারা আজ শুধু পূজা গ্রহণ করে, কথা কয় না, নির্বাক নিশ্চুপ! পাছে কথা কয়ে আমার ধ্যান ভঙ্গ করে, তাই দেবতাকে করেছি পাথর – জমানো অশ্রুর শ্বেতমর্মরের দেবতা!

এই একটা বৎসরে কত অঘটনই না ঘটল। শুধু আমার জীবনেই নয়, সারা সৃষ্টিটা জুড়ে। মন্থন শেষে সৃষ্টি আজ নিষ্পন্দ – সাড়া-শব্দহীন। সে যেন আজ তার লাভক্ষতির হিসাব খতিয়ে দেখছে অন্ধকার নির্জনে বসে প্রকৃতির খাতা খুলে। খরচের লাল কালি আজ তার জমার সবুজ কালিকে লজ্জা দিচ্ছে।

যুদ্ধ থেমে গেছে! আর্মিসটিস! শান্তি! মহাপ্লাবনের পর পিতা নুহ্ যেন ধ্যানে বসেছেন। সারা সৃষ্টি উন্মুখ প্রতীক্ষায় তাঁর কুটির দ্বারে দাঁড়িয়ে। তার সকল অনুশোচনা, সকল গ্লানি এই মহামৌনীর আঁখির প্রসাদে ফুল হয়ে ফুটে উঠুক এই আশিস আজ সে চাইতে এসেছে। ঐশ্বর্য-মদমত্ত দাম্ভিক আজ ভিখারির কুটিরদ্বারে ভিক্ষার্থী। এ দৃশ্য অভিনব, অদ্ভুত, না দিদি?

এই একটা বৎসর ধরে আমার কেটেছে ইরাকের মরু প্রান্তরে, ফোরাতের কূলে কূলে, শুকনো পর্বতের অস্থিশ্মশানে। ইচ্ছা করলে যে চিঠি লিখতে পারতাম না, তা নয়। ইচ্ছা করেই লিখিনি। এই একটা বৎসর ধরে আমার কেবলই ভয় হয়েছে, এই বুঝি কারুর চিঠি এসে পড়ল! একেবারে যে আসেনি, তা নয়। এবং সে সব চিঠি আপনাদেরই। তার অনেকগুলো আজও পড়িনি – কেন যে এ দুর্বলতা আমার তা নিজেই জানিনে। ভয় হয়, ওগুলোতে কত যেন দুঃসংবাদ, কত যেন অভিশাপ লুকিয়ে আছে। অথচ ফেলেও দিইনি। মনে করেছি যেদিন আমি ধ্যান-শান্ত হতে পারব – বাইরের কোনো দুঃসংবাদই আমার মনে দোলা দিতে পারবে না – এইরূপ বিশ্বাস হবে আমার নিজের উপর, সেই দিন খুলব ওগুলো।

যেগুলো খুলে পড়েছি, তাতে যা সব জেনেছি তার বেশি জানবার আমার বর্তমান জীবনে প্রয়োজন দেখিনে। মনে হয় আমার জানাশোনার হিসাব-নিকাশ চুকে গিয়ে এবারের মতো কৈফিয়ত কাটা হয়ে গেছে। এবারের মতো আমার বেচাকেনা বন্ধ।

আচ্ছা সাহসিকাদি, পুরুষগুলো মেয়েদের চেয়ে একটু চোখে খাটো না? অন্তত, ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট – কাছের দৃষ্টিটা খারাপ। কাছের জিনিসকে ওরা উপচক্ষু ছাড়া দেখতে পায় না। কিন্তু দূরের জিনিস দিব্যি সাদা চোখে দেখতে পায়। সোফিটাকে দেখেছি – মাহ্‌বুবার চেয়েও কাছে করে, কিন্তু পাতার আড়ালে যে বেদনার কুঁড়ি ধরেছিল – তা আমার এই হাজার মাইল দূরে চলে আসার আগে আর চোখে পড়েনি, কিন্তু দূরের এ-দৃষ্টিটা হয়ে উঠেছে আমার বরে শাপ।

এখন যখন একান্ত চিত্তে মনের তলা হাতড়িয়ে দেখি, তখন ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠি। মনে হয়, কে যেন আমায় দেখে ফেললে! চিরকাল এ মনে শুধু একটি মুখেরই প্রতিচ্ছবি পড়েছে – এই ছিল আমার ধ্রুব বিশ্বাস। চিত্ত যেদিন আর একজন দেখিয়ে দিলে মনটাকে নাড়া দিয়ে যে, পিছনে হলেও সেও আছে সেখানে – তখন স্তব্ধ হয়ে গেলাম ভয়ে বিস্ময়ে-বেদনায়। আমার কেবল মনে হতে লাগল, এইবার একটা প্রলয় না হয়ে যায় না। আকাশে যদি কোনোদিন দুটো সূর্য ওঠে, তাহলে সেদিন ভীষণ কিছু একটা হবে, একথা পাঁজিতে না লিখলেও আমি বিশ্বাস করি।

সেই প্রলয় হয়তো ঘনিয়ে এসেছে সাহসিকাদি আমার জীবনে। এক সূর্য আলো দেয়, কিন্তু দুটো সূর্য দগ্ধ করে। আমার মন পুড়ে যাচ্ছে – তাই বিষের ওষুধ বিষ মনে করে এই দগ্ধীভূত মরুভূমিতে এসে পড়েছি। মনে করেছি, এই পোড়া দেশের মরুভূমি দেখে সান্ত্বনা খুঁজব। আমি আজ এই মনের অগ্নিকুণ্ডে আত্মস্থ হয়ে তপস্যা করবার চেষ্টা করছি। প্রার্থনা করো যেন বিফল না হই।

আমি আর কোথাও চিঠি দেব না, কাউকে না তোমায়ও না। আর আমার খোঁজ করবার চেষ্টা কোরো না। মনে কোরো ধূমকেতু দেখার মতো দু-দিন একটা অমঙ্গলকে দেখে স্নেহ করেছিলে, ভালোবেসেছিলে। আজ সে অকস্মাৎ এসে

আবার অকস্মাৎ হারিয়ে গেল, তখন ওকে আবার দেখতে চাওয়া পণ্ডশ্রম। ধূমকেতুর একটা নিয়ম আছে – সেই নিয়মাধীন যদি হই, তবে আবার দেখা দিব, আপনারা দেখতে না চাইলেও।

খবর পেয়েছি সোফির বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের পরই তার ভীষণ অসুখ, হয়তো বা বাঁচবে না। আমার চেয়ে সে খবর আপনিই বেশি জানেন। আর একটা ভীষণ খবর পেয়েছি, মাহ্‌বুবা হতভাগি বিধবা হয়েছে, তার বৃদ্ধ স্বামী মারা গেছেন। মাহ্‌বুবা নিজে লিখেছে চিঠি। সে লিখেছে, সে-ই এখন সমস্ত জমিদারির মালিক। সংসারে আর তার মন নাই ; সে নাকি শিগগিরই পবিত্র স্থানসমূহ পর্যটন করতে বেরোবে, মক্কা-মদিনাও আসবে এবং আরও লিখেছে বোগদাদ শরিফও আসতে পারে। আমি বারণ করিনি। আর আমার ভয় নেই তাকে।

যে মাহ্‌বুবা একদিন স্বেচ্ছায় আমাকে পাওয়ার লোভ দুহাতে ঠেলে দিয়েছিল ; আমার মহৎ জীবন পাছে বিবাহের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই আমাকে নিজে হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিলে – তাকে যদি আজ অযথা সন্দেহ করি, তাহলে আমার ইহকালে পরকালে কোথাও মুক্তি হবে না, সাহসিকাদি।

আমাদের পল্টন শিগগির ফিরে যাচ্ছে। শিগগির সব ভাইরা আমার দেশে ফিরবে। আমিই আর ফিরব না।

আমি আবার তিন বছরের জন্য অঙ্গীকারপত্র লিখে দিয়ে যুদ্ধ অফিসে নতুন কাজ নিয়েছি। ইচ্ছা করলেও আর যেতে পারব না এ তিন বছরের মধ্যে।

আমার বাঁধনহারা জীবন-নাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এর পর কী আছে, তা আমার জীবনের পাগলা নটরাজই জানেন।

আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে, আবার যখন আসব রঙ্গমঞ্চে – তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি, সকল দ্বন্দ্ব কেটে যায় – আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের সকলের চোখে চোখে তাকাতে পারি। ইতি –

অভিশপ্ত
নূরুল হুদা

(সমাপ্ত)